BEST WISHES FROM;-
INDCHEMIE HEALTH SPL. PVT. LTD.
MAKERS OF :-
PEPTARD/D 20 INDCLAV 625/B ID / 375 / DS DV 60K.

জুন - ২০১৮

স্বাস্থ্য ভাবনা মাসিক

e-mail- pradipdr2@gmail.com

বর্ষ ১৯ ০ সংখ্যা ১১ ০ ফোনঃ (০৩৩) ২৬৫২-৪৮৯৯ ফ্যাক্স (০৩৩) ২৬৫২-১৫৫৯ ০ [RNI No.71448/99] ০ Postal Reg. No.:PMG(SB)-117SHY ০ দাম ২

With Best Compliments From:-
EUPHORIC PHARMACEUTICALS LTD
Makers of:-
Azyric 250mg, 500mg Tab.
Eufoquin-O Tab
Doxyric 100 mg Tab.

যোগচর্চা

পৃ- ৩

সাপমুক্তি পৃ- ৬

সানস্ট্রোক

পৃ- ১

নিপা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে চাই কড়া নজরদারি

ডাঃ পি কে দাস

কেরলের কোজিকোড জেলার চ্যানগারোথ গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হলেন একটি প্রাইভেট নার্স প্রবল জ্বর, মাথার যন্ত্রণা ও বেহুঁস অবস্থায়। নাম তার লিনি সাজিড। বয়স মাত্র ২৮ বছর। অসুস্থ অবস্থায় জ্ঞান হারানোর ঠিক আগে একটি চিঠি লিখে যান তাঁর স্বামীর জন্যে, "সজিত আমি চলে যাচ্ছি। সময় আমার শেষ হয়ে আসছে। আমাদের হয়তো আর দেখা হবে না, তবে বাচ্চা দুটোকে দেখো আর দূরে কোথাও চলে যেও।" হ্যা, লিনি আর বাঁচে নি। সেইসঙ্গে ঐগ্রামপঞ্চায়েতের ২৬ বছর বয়সী মহম্মদ সাদিক ও তার দাদা ২৪ বছর বয়সী মহম্মদ সালিহা গত ৫ মে ও ১৮ মে মারা যায় ধুম জ্বর, মাথার যন্ত্রণা ও বেহুঁশ অবস্থায়। শুধু তাই নয় গত কয়েকদিনে কেরালায় পরপর ১০ জন মারা যায় একই জায়গা থেকে ঐ জ্বর নিয়ে। চিকিৎসকদের পরীক্ষা নিরীক্ষায় ধরা পড়ে ঐ জ্বরের কারণ হল নিপা ভাইরাস সংক্রমণ। এই ভাইরাসের সংক্রমণ হয় পশুপাখী থেকে। পরে মানুষ থেকে মানুষেও সংক্রমণ ছড়ায়। এই ভাইরাস প্রথম ধরা পড়ে কামপুং সাংহাই,

(সাতের পাতায় দেখুন)

অবেদন পদ্ধতি ও অবেদক

ডাঃ শুভাশীষ চক্রবর্তী রায়চৌধুরী

পৃথিবীতে পা রাখার পর থেকেই মানুষ যন্ত্রণার শিকার হয়েছে। নিজেকে টিকিয়ে রাখতে বিভিন্ন রোগের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। প্রয়োজনে ধারাল অস্ত্রও নিজের দেহে ব্যবহার করেছে এবং দাঁতে দাঁত দিয়ে অসম্ভব যন্ত্রণাকেও মুখ বুজে সহ্য করেছে। কখনও কখনও সহ্য সীমা অতিক্রম করলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। মদ পান করিয়ে, আফিম খাইয়ে অজ্ঞান করে শল্য চিকিৎসা করা হত। অনেক সময় অস্ত্রোপচারের সময় এই অসহ্য যন্ত্রণা মানুষকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার আশায়। সেই সময় বৈজ্ঞানিকরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন এর একটা হেস্ত নেস্ত করবার জন্য। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আজ অবেদন পদ্ধতি এমন এক জায়গা এসেছে, যাকে ছাড়া চিকিৎসা জগতের অনেক কথাই অস্পষ্ট মনে হয়।

ভারতবর্ষে অবেদন পদ্ধতির ইতিহাস আরও এক অনন্য নজির তুলে ধরে। এদেশের অবেদন পদ্ধতির আলোচনা করতে গেলে তা তিনভাবে ভাগ করতে হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ বছর আগে শুশ্রুত (শল্য চিকিৎসার জনক) আফিম, মদ, সিদ্ধি বা ভাঙ জাতীয় মাদক পদার্থ খাওয়ানোর সঙ্গে হাত পা বেঁধে শল্যচিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার করতেন। যীশুখৃষ্টের জন্মের ৫২৭ বছর পর রাজা ভোজের মস্তিষ্কে এক অস্ত্রোপচার হয়, তখন সম্মোহনী ও সঞ্জীবনীর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে মদ্যপানের দ্বারা রোগীকে আচ্ছন্ন করে

(দুয়ের পাতায় দেখুন)

বুদ্ধি বাড়াতে রোজ মাছ খান

রিংকী ব্যানার্জী

আগেকার দিনে একটা প্রবাদ ছিল- ঝাল খেলে বুদ্ধি বাড়ে, আর এখন গবেষকরা নতুন একটি তথ্য দিয়েছেন ছোট বয়স থেকেই ডায়েটে নিয়মিত ভিত্তিতে মাছ থাকলে বুদ্ধি বাড়ে। আর বাঙালি ও অসমিয়াদের কাছে মাছ যে অতি প্রিয় একটি খাদ্য তা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেলসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণা থেকে এই তথ্য সামনে এসেছে। সেখানকার একটি সমীক্ষাপত্রে বলা হয়েছে, ছোট থেকেই শিশুদের যদি রোজ মাছ খাওয়ানো হয়, তবে তাদের বুদ্ধির জোর ধারালো যে হবেই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে বাচ্চাকে মাছ খাওয়ানোটা একটু ঝক্কির ব্যাপারে। কেউ কেউ খেতে চায় না, কাউকে আবার রোজ মাছ দিলে মুখ ঘুরিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে গবেষকরা বলেন চিন্তার কিছু নেই। প্রতিদিন যদি শিশুদের মাছ নাও খাওয়ানো যায়, সেক্ষেত্রে দুদিন বা তিনদিন মাছ খাওয়ালেই যেসব বাচ্চা একেবারেই মাছ খায় না, তাদের তুলনায় মাছ খাওয়া বাচ্চাদের আই কিউ চার পয়েন্ট এগিয়ে থাকে। এমনকি সপ্তাহে তিন বা চারদিন মাছ খাওয়া বাচ্চাদের আই কিউ স্বাভাবিকের তুলনায় ৩.৪ পয়েন্ট বেশি হয়। এখন প্রশ্ন হলো, গবেষকরা বাচ্চাদের কেন তুলনায় ৩.৪ পয়েন্ট বেশি হয়। এখন প্রশ্ন হলো, গবেষকরা বাচ্চাদের কেন এই গবেষণার জন্য বেছে নিলেন ? তার উত্তরে বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, বাচ্চা বয়সেই সবদিক থেকেই মানুষের শ্রোথ হয় আর এসময় সঠিক পুষ্টি পাওয়ার অর্থ বুদ্ধ্যঙ্কর (আই কিউ) বিকাশ, অতি দ্রুতই তারা নতুন কোনও কিছু শিখে বা মুখস্থ করে নিতে পারবে।

(দুয়ের পাতায় দেখুন)

সানস্ট্রোক

সানস্ট্রোক বা হিট স্ট্রোক আমাদের কাছে এক পরিচিত নাম। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও নতুন কিছু নয়। এটি তাৎক্ষণিক রোগ এবং আপৎকালীন চিকিৎসাব্যবস্থা না করলে অনেক সময় জীবন হানির আশংকা থেকে যায়। চেনা রোগ হলেও এর কারণ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানি না। এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালের সিনিয়র সার্জেন ডাঃ তুষার কান্তি চ্যাটার্জী। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন স্বাস্থ্য ভাবনা মাসিক পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি ওসিউর রহমান।

প্রঃ সান স্ট্রোক কি ?

উঃ সান স্ট্রোক অথবা হিট স্ট্রোক এক ভয়ঙ্কর জীবন সংশয়কারী অবস্থা যখন আমাদে দেহের তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রী সেলসিয়াসেরও (১০৫.৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট) বেশি হয়। এ ফলে আমাদের হৃদযন্ত্র থেকে রক্ত নির্গমন কমে আসে, শরীরে ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়।

প্রঃ সানস্ট্রোকের কারণ কি ?

(দুয়ের পাতায় দেখুন)

একটু হাসুন

মা, ছেলেকে : বাবা তোমাকে সত্যিকারের মানুষ হতে হবে।
ছেলে : তাহলে সবাই যে বলে তুই মায়ের মত দেখতে.....!

অন্যান্য প্যাথির যথোপযুক্ত কল্যাণকর কার্যকারিতার ক্রমউন্নতির সাথে সাথে হোমিওপ্যাথির যত তাড়াতাড়ি প্রচার ও প্রসার বাড়বে ততই মানুষের মঙ্গল।

সবার কল্যাণ কামনায়.....

হ্যানিম্যান মিশন

প্রধান কার্যালয় :-
৬৫/৩,বিধানপল্লী,কলিকাতা-৮৪
ফোন :- ২৪৮১-৫৭৬০, ৯৮৩০২৮২৪১৯

Scanned by CamScanner

আমাদের অঙ্গীকার
নরেশ চন্দ্র দত্ত

আমি বিশ্ব প্রকৃতির অংশ
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কিছু সজীব
আমি তারই অংশ।
সকল জীবের সাথে অদৃশ্য
বন্ধনে আবদ্ধ আমি।
আমার জীবন প্রকৃতি নির্ভর
নির্ভর প্রকৃতির ভারসাম্যের ওপর।
প্রকৃতি ও তার সম্পদের প্রবহমানতার
ওপর।
প্রকৃতিকে ধ্বংস করা
নিজেকেই ধ্বংস করা।
মানবজাতির আমি একজন।
প্রকৃতির স্থায়িত্ব
আমি বিশ্ব প্রকৃতির অংশ
করাবো না আমি প্রকৃতির ধ্বংস।

চক্ষুদানের প্রচারে বাইক চেপে নয় জেলা সফর

অন্ধত্ব দূর করতে মরণোত্তর চক্ষুদানের প্রচারের উদ্দেশ্যে হুগলির রাজবলহাট কালচারাল সার্কেলের চার তরুণ সুরজিৎ শীল, উত্তম কুমার সেন, বুদ্ধদেব মাঝি ও অনন্ত সাহা বাইক চেপে গত ২ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করে। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় নটি জেলার প্রায় হাজার কিলোমিটার প্রচারে সামিল হয় এই চার তরুণ। বিভিন্ন জেলায় যে সব সংগঠন মরণোত্তর চক্ষুদানে কাজ করে সেই সব সংগঠন স্থানীয়ভাবে এই চার তরুনের প্রচারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

ক্যান্সার জয় করে ঘোড়দৌড়ে অবিশ্বাস্য বিশ্বরেকর্ড

কোমরের হাড় ভেঙেছিল। কালান্তক ক্যান্সার গ্রাস করেছিল শরীর। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিশ্বের ঘোড়দৌড়ের দুনিয়ার অবিশ্বাস্য কীর্তি স্থাপন করলেন ৫৬ বছরের ব্রাজিলিয়ান জকি জর্জ রিকার্ডো। ঘোড়দৌড় দুনিয়ায় একমাত্র রাসেল বেজে আর জর্জ রিকার্ডো কে বাদ দিলে পৃথিবীর আর কোনও জকি ১০ হাজার পয়েন্ট কোনও দিন ডিঙিয়ে যেতে পারেন নি। দীর্ঘ চার দশকের অক্লান্ত পরিশ্রম,অমানুষিক মনের জোর প্রৌঢ় রিকার্ডোকে বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জকির শিরোপা এনে দিল। নিজের চির প্রতিপক্ষ রাসেল বেজে-র সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রেকর্ডটি ভাঙতে হলে দরকার ছিল ১২,৮৪৫ পয়েন্ট। সেই অনন্য কীর্তি গড়ে ফেললেন জর্জ রিকার্ডো।

স্যানিটারি ন্যাপকিন

লালগোলা থানার প্রত্যন্ত এলাকার লস্করপুর হাইস্কুলে এবার থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে দু টাকার মুদ্রা ফেললেই পাওয়া যাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন। ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কথা মাথায় রেখে প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামের বিদ্যালয়ের এই ব্যবস্থা চালু করা হল।

সানস্ট্রোক

(একের পাতার পর)

উঃ ১) পারিপার্শ্বিক প্রচন্ড গরম আবহাওয়া, ২) অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম-বিশেষ করে যারা সচরাচর অভ্যস্ত নন অথবা সঠিক পোশাক না পরে গরমে কাজ করা।

প্রঃ কাদের সানস্ট্রোকে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি?

উঃ বিপদের ঝুঁকিটা বাড়ে- ১) শিশু ও বয়স্ক হলে, ২) তাপপ্রবাহ (লু) এবং ভ্যাপসা গরমে, ৩) কিছু ওষুধ সেবনে যেমন ডাইউরেটিকস্ (ল্যাসিক্স) বিটা ব্লকার, অ্যালকোহল, ৪) যাঁরা হার্টের রোগ, ডায়াবেটিস চর্মরোগে ভোগেন, ৫) অনেকদিন নানা অসুখে ভুগে শরীর দুর্বল, ৬) অনেক সময় কোন রোগ নেই, কোন ওষুধও খান না, তরুন ছেলেমেয়েরাও আক্রান্ত হতে পারে যেমন দৌড়বীর, শ্রমিক ও মিলিটারি যারা প্রচন্ড গরম আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করছেন।

প্রঃ কিভাবে বুঝবো সানস্ট্রোক হতে চলেছে?

উঃ অনেক সময় সানস্ট্রোক হওয়ার আগে আক্রান্ত ব্যক্তির গরমজনিত ক্লান্তির লক্ষণ দেখা যায়। যেমন মাথা ঘোরা, মানসিক বিহ্বলতা। মাথার যন্ত্রণা, দুর্বলতা।

প্রঃ সানস্ট্রোকের লক্ষণ কি কি?

উঃ ১) অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা, ২) ঘাম না হওয়া আবার অনেক সময় প্রচুর ঘর্ম নিঃসরণ।৩) অল্পবয়স্কদের অনেক সময় খিঁচুনি হতে পারে, ৪) রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, ৫) রোগীর গাত্র শুকনো, রক্ত ক্ষরণ হতে পারে, ৬) দেরী হলে রোগীর বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, কিডনি বিকল হয়ে রোগী মারা যেতে পারে।

প্রঃ সানস্ট্রোকের চিকিৎসা কি?

উঃ ১) দ্রুত শীতলিকরণের ব্যবস্থা করা। ২) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে রোগীর পুনঃজীবনের চেষ্টা করা।

শীতলীকরণ ঃ-

১) রোগীকে দ্রুত ঠান্ডা পরিবেশে নিয়ে যেতে হবে। হয় ঘরের ভেতর অথবা কোন ছায়াময় স্থানে।

২) পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ করে আঁটোসাঁটো জামাকাপড় যতটা সম্ভব উন্মোচিত করে দেওয়া যাতে স্বাভাবিকভাবেই দেহ ঠান্ডা হতে পারে।

৩) সক্রিয়ভাবে শীতলিকরণ- রোগীকে ঠান্ডা জলে স্নান করানোর ব্যবস্থা করা।

৪) একটি বাথটবে রোগীকে শোয়ালে ভালো হয়, সতর্ক থাকতে হবে রোগীর মাথা যেন জলের ওপরে থাকে।

৫) রোগীর বুকে, পিঠে, মাথা, ঘাড়ে কুঁচকির অংশে ঠান্ডা 'কমপ্রেস্স' করতে হবে।

৬) জোরে ফ্যান চালাতে হবে।

৭) এসি থাকলে চালিয়ে দিতে হবে, এগুলি জল বাষ্পীভবনে সাহায্য করে। দেহকে শীতল রাখবে।

অনেকের মতে জীবন সংশয়কারী সানস্ট্রোকের রোগীকে বরফ ঠান্ডা জলে অবগাহন করানো একটি উত্তম পদ্ধতি।

জলিকরণ (হাইড্রেশন)

কম গুরুতর ক্ষেত্রে রোগীকে পানীয় জল এবং ইলেকট্রল পাউডার জল প্রচুর পরিমাণে দিতে হবে।

গুরুতর ক্ষেত্রে রোগীকে 'ইন্ট্রাভেনাস' বা শিরার মাধ্যমে শরীরে স্যালাইন জল দিতে হবে।

পরবর্তী পদক্ষেপ

পরবর্তী পদক্ষেপে রোগীর আরোগ্যর জন্য ডাক্তার এবং প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল স্টাফ দরকার হতে পারে।

নিয়মিত রোগীর নাড়ির পরীক্ষা, শ্বাস প্রশ্বাসের প্রকার এবং গতি দেখা দরকার। রোগীর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট' বা হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে-সি পি আর বা কার্ডিও পালমোনারি রিসিটেশানের প্রয়োজন হতে পারে।

প্রঃ সানস্ট্রোক কিভাবে প্রতিরোধ করব?

উঃ অত্যধিক গরম আবহওয়া এবং নির্জলা অবস্থা পরিহার করা।

হালকা এবং ঢিলেঢালা জামাকাপড় করা। হালকা রঙের চওড়া টুপি অথবা ছাতা, টোকায় মাথা ও ঘাড় রক্ষা করতে হবে। মাথা ও মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। দিনের আলোয় গরম আবহাওয়ায় অত্যধিক পরিশ্রমসাধ্য কাজ, ব্যায়াম এড়িয়ে চলতে হবে।

এসি'র সুবিধা বা হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা ছাড়া বন্ধ ঘর অথবা গাড়ীর মধ্যে থাকা উচিত নয়।

প্রচুর পরিমাণে জলপান করতে হবে, তৃষ্ণা দিয়ে অনেক সময় বোঝা যায় না, প্রস্রাবের রঙই বুঝিয়ে দেয় (ঘন হলুদ' শরীরে জলের অভাব।

গরমে অত্যধিক চা ও মদ্যপান পরিহার

রোজ মাছ খান

(একের পাতার পর)

এই গবেষণার প্রধান গবেষক পিনটো মারটিনের মতামত, শিশুদের যদি নিয়মিতভাবে মাছ খাওয়ানো যায়, তাহলে তাদের ঘুমের মাত্রা ঠিক থাকে আর বুদ্ধির জন্য ভালো ঘুম হওয়া দরকার। শুধু বেশিক্ষণ ধরে ঘুমোনোই নয়, এক নাগাড়ে সাউন্ড স্লিপ হওয়ার পিছনেও যে মাছের একটা ইবিচক ভূমিকা রয়েছে, সেই দিকটিও এই গবেষণা থেকে উঠে এসেছে। এই সমীক্ষা করা হয়েছিল চিনে। সেখানকার প্রায় ৫৪১ জন শিশুকে এই গবেষণার জন্য বাছা হয়েছিল যাদের গড় বয়স ৯-১১ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ ছিল ছেলে ও বাকি ৪৬ শতাংশ মেয়ে। শুধু সেইসব বাচ্চাদেরই আই কিউ পরীক্ষা করা হয় নি, তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে জানা হয়েছিল তারা কোন বয়স থেকে মাছ খাওয়া শুরু করেছে, সপ্তাহে কটা মাছ খায়, ছোট মাছ না বড় মাছ, সারাদিন বাচ্চা ঘুমায় কি না, রাত্রে কত ঘন্টা ঘুম হয় ইত্যাদি। এবং প্রত্যাশিতভাবে ফলাফল প্রমাণ করেছে, সপ্তাহে অন্তত দুদিনও যেসব বাচ্চা মাছ খেয়েছে, তাদের আই কিউ নিরামিষাশী বাচ্চাদের তুলনায় অনেকগুণ এগিয়ে আছে এবং সমীক্ষায় সময়ে এদের যেসব টাস্ক দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোও এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলনায় অনেক ঝটপট শেষ করে নিয়েছে।--৮৩৭১০২৫৫০৩

অবেদন পদ্ধতি

(একের পাতার পর)

অস্ত্রোপচার করা হত। পরের ধাপে দেখা যায় ১৮৪৩ সালে James Esdaile হুগলীর ইমামবাড়া হাসপাতালে Mesmerism বা সম্মোহন দ্বারা অবেদন পদ্ধতির প্রয়োগ করেন বলে জানা যায় এবং তিনি ২১৬ টি ক্ষেত্রে ঐ পদ্ধতি ব্যবহার করলেও পরবর্তীকালে Englishman 1845, 22 september) জানা যায় ঐ পদ্ধতিতে সকল ক্ষেত্রে সমান ফল পাওয়া যায় নি।

ভারতবর্ষে প্রথম ইথার ব্যবহার কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, সেটা হল ১৮৪৭ সালের ২২ মার্চ, সোমবার, Dr. O'Saughnessy (শল্যচিকিৎসক) এর তত্ত্বাবধানে।

David Waldie ছিলেন এক জন কেমিস্ট যিনি Chloroform কে চিকিৎসায় ব্যবহারে আনার জন্য স্বনামধন্য হন। তিনি ১৮৫৩ সালে কলকাতায় আসেন এবং কলকাতার কাছেই হুগলী জেলার কোন্নগরে জিটি রোডের পাশে এর রাসায়নিক কারখানা স্থাপনা করেন ও আমৃত্যু (১৮৮৯) সেখানেই ছিলেন।

বর্তমানে Anaesthesiology, Anaesthetist or Anaesthesiologist শব্দগুলোর সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচিত হয়েছে। ইংরাজীতে Anaesthesia শব্দটাই বাংলায় অচেতন ও অবেদন এই দুই পদ্ধতির কথাই বোঝায়। অচেতন ও অবেদন এই দুইটি পদ্ধতির সঙ্গে একটু বিশেষ পরিচয় হলে মনের মধ্যে সংশয় দূর হয়ে যাবে। যে পদ্ধতিতে জ্ঞানহীন অবস্থায় অর্থাৎ অচেতন অবস্থায় কোনও রোগীকে নিয়ে যাওয়ার পর অস্ত্রোপচার করা হয় তাকে Anaesthesia বলি আবার শরীরের বিশেষ কোনও অঙ্গকে অসাড় করে অর্থাৎ বেদনা মুক্ত বা অবেদন অবস্থায় কোনও রোগীর শল্য চিকিৎসাও এক ধরণের Anesthesia পদ্ধতি। যিনি এই সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করেন তিনি Anaesthetist। যিনি এই সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করেন তিনি Anaesthesiologist। যিনি এই সকল পদ্ধতির চর্চা করেন ও ব্যবহারিক প্রয়োগ করেন তিনি Anaesthesiologist। এঁরাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভবিষ্যতের আধুনিক ওষুধ ও বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকেন।

Anaesthesia পদ্ধতি কয়েক রকমের হয়। সম্পূর্ণ অচেতন করে অর্থাৎ General Anesthesia করা হয় তখন অক্সিজেন, নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস, ইনজেকশন এর মাধ্যমে কিছু ওষুধ ছাড়াও কিছু উদ্বায়ী পদার্থ (ইথার, হ্যালথেন, সেভফ্লুরেন) ব্যবহার হয়। শরীরের কোনও এক জায়গায় ইনজেকশন এর মাধ্যমে General Anaesthesia ওষুধ প্রয়োগ করে বেশ অনেকটা জায়গা অবশ বা বেদনাহীন করেও করা যায়। একে Regional Anaesthesia বলে। পিঠের শিরদাঁড়ার ভিতরে ওষুধ প্রয়োগ করে কোমর থেকে পা পর্যন্ত অবশ বা বেদনাহীন করাকে Spinal Anaesthesia বলে। এছাড়া শরীরের যে অংশে শল্য চিকিৎসা হবে সেই জায়গাটুকু যে নার্ভ কাজ করে, ওষুধের সাহায্যে তার সংবেদনশীলতা সাময়িকভাবে নষ্ট করে অবশ করলে তাকে Local Anaesthesia বলে। এছাড়া যে অংশে শল্য চিকিৎসা হবে তার চারদিকে ঘিরে ইনজেকশন এর মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগ করে বেশ অনেকটা জায়গা অবশ করা হয় একে Field block বলে। শিরার মধ্যে ইনজেকশন দিয়ে কিছু শুধু হাত বা পা অবশ করার বিশেষ পদ্ধতিতে Intravenous Anaesthesia বলে। Inj Ketamine HCL নামে এক যুগান্তকারী Anaesthetic ওষুধ আবিস্কারের পর কম সময়ে অস্ত্রোপচার বেশ সহজেই করা হয়। তবে সব ওষুধ সকলের জন্য ব্যবহার করা যায় না। ইনজেকশন এর মাধ্যমে ছাড়াও ওষুধ সরাসরি শল্য চিকিৎসার জায়গায় প্রয়োগ করেও করা যায় একে Topical Anaesthesia বলে। এক্ষেত্রে ইনজেকশন দেওয়ার কষ্টটুকুও পেতে হয় না। আজকাল চোখের ছানি Topical Anesthesia তেই অনেক সময় করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক ওষুধ, পদ্ধতি ও রোগীর অবস্থা বিচার করেই ব্যবহার করতে হয়। যে কোনও পদ্ধতির জন্য আগে থেকে রোগীকে পরীক্ষা করে নিতে হয় কারণ Anaesthesia পদ্ধতিতে শরীরের স্বাভাবিক কার্যপ্রণালী কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হয়। যা শরীর সহ্য করতে নাও পারে। Anaesthesia পদ্ধতি প্রয়োগের আগে ও ব্যাপারে যতটা সম্ভব নিশ্চিত হয়ে নিতে হয়। যদিও ১০০ শতাংশ নিশ্চিত হওয়া যায় না। জরুরী অবস্থায় বেশ ঝুঁকি নিয়েই Anaesthesia পদ্ধতিতে তাদের ভাষায়া বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। যে কারণে অস্ত্রপচার করা দরকার তা ছাড়া রোগীর অন্য কোনও অসুখ থাকলে তার সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হয়, বিশেষ করে এ্যাজমা, হাই ব্লাড প্রেসার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, রক্ত তঞ্চনের গন্ডগোল বা কোনও এ্যালার্জী জাতীয় অসুখ থাকলে। মূল অস্ত্রোপচার ও অ্যানাস্থেশিয়া ঐ সময়ে সকল অসুখ রোগীর জীবনে আঘাত হানবে কি না ওটাও ভাবতে হয়। সব অস্ত্রোপচারের পরবর্তী সময়ে কোনও সমস্যা দেখা দিলে সেটা অস্বাভাবিক না। এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব চিকিৎসা শাস্ত্র বইতে লেখা আছে যা সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ মেনে নিয়েছেন। তাই সব ক্ষেত্রে রোগীর আত্মীয়স্বজনের বিশেষ অনুমতি নিয়েই করতে হয়। তবে অনুমতি দেওয়া মানে এই নয় যে জীবনাশঙ্কা কমে যাবে। কাজেই এই কাজটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুঁকিরও বটে। রোগীর আত্মীয়স্বজনের ক্ষোভ তখনই দেখা দেয় যখন চিকিৎসক বা তাঁর সহকারীদের সহমর্মিতার অভাব থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সব কিছু করেও অপবাদের ভাগী হতে হয়। রোগীকে ভাল করার চেষ্টা চিকিৎসক বা তাঁর সহকারীদের থাকেই কারণ তাতে তাদেরই সুনাম হবে তাই সব ক্ষেত্রে না জেনে অপবাদ দেওয়া ঠিক নয়। একই সমাজে থেকে উভয় পক্ষের সহযোগিতাতেই রোগী নিরাময়তা লাভ করে।

Scanned by CamScanner

ধারাবাহিক প্রতিবেদন

বাচ্চার পরীক্ষার প্রস্তুতি

অজিত মন্ডল

পরীক্ষা আসা মানেই বাবা- মায়ের টেনশনের শেষ নেই। কিন্তু পরীক্ষার প্রস্তুতিতে পরীক্ষার্থীদের মন ও শরীরে যে অতিরিক্ত চাপ পড়ে তার দিকে অভিভাবকরা সঠিক খেয়াল রাখেন কি? এই সময়টায় এদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যর দিকে বিশেষ নজর দেওয়াটা জরুরি। সেইসঙ্গে আরও জরুরি বাচ্চাদের মনে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলা। এ সময়ে অভিভাবকদের কি কি করা উচিত দেখা যাক-

পড়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিন

এ বিষয়টি যদিও খুব পুরানো কারণ পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আমরা সকলেই অতিরিক্ত সময় দিয়ে এসেছি। আসলে কোন বিষয় শেখার পর তাকে মনে রাখা একদিনের কাজ নয়। তাই প্রতিদিন অল্প অল্প করে পড়লে পরীক্ষার সময় পড়ার অতিরিক্ত চাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ এটা দেখার যাতে পরীক্ষার আগে পড়ার জন্য অনেকটা সময় হাতে থাকে। এজন্য বাবা মায়ের উচিত স্কুল পড়ুয়া সন্তানের জন্য একটা 'টাইম টেবল' তৈরি করা। যেখানে গুরুত্ব পাবে পড়ার জন্য পড়ুয়ার ব্যবহার যোগ্য সময় কতটা পাওয়া যাবে তার সঙ্গে অভিভাবক কতটা সময় দিতে পারবেন এবং তা কখন কখন। সব সময় দেখতে হবে উভয়ের মধ্যে যেন একটা কমন টাইম থাকে। এই টাইম টেবল তৈরি করতে হবে নিজস্ব সুবিধা মত তাই অন্য কারও তৈরি টাইম টেবল অনুসরণের প্রয়োজন নেই।

পড়ার জন্য খোলামেলা পরিবেশ

স্থান ও পরিবেশ পড়ুয়ার পড়ার ওপর ভীষণ প্রভাব ফেলে। পড়ার জায়গা হওয়া উচিত খোলা মেলা, হাওয়া বাতাসযুক্ত। দমবন্ধ পরিবেশে কখনও পড়া ভালো হয় না। পড়ার ঘরে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যতীত অন্য সামগ্রী না থাকা উচিত। না হলে মন ঠিকমত পড়ায় বসে না। বসার চেয়ার হতে হবে আরামপ্রদ। মেঝেতে বসে পড়লে আগে মেঝেতে নরম কিছু পেতে বসা উচিত। কিছু বাচ্চা আছে যারা গান শুনতে শুনতে পড়তে ভালোবাসে সেক্ষেত্রে বাচ্চা কি ধরণের পরিবেশ পছন্দ করে সেদিকে অভিভাবকদের নজর দেওয়াটা আবশ্যিক।

পড়ুয়ারা যা করবে

লেখার সঙ্গে পড়া

কথাতেই তো আছে 'লেখাপড়া'। তোমরা সারাদিনে যা পড়লে তা খাতায় লেখার চেষ্টা কর। তারপর পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো সব ঠিকঠাক লিখেছো কিনা? ভুল হলে সেগুলিকে ঠিক করে নাও। চার্ট তৈরির অভ্যাস কর। এটা খুব ভালো অভ্যাস। এতে লেখার গতি বাড়বে যা পরীক্ষায় নির্দিষ্ট সময় প্রশ্নপত্রের সব উত্তর লেখার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। 'সময়ের অভাবে' প্রশ্ন ছেড়ে আসার মত অপ্রিয় পরিস্থিতি এড়ানো যাবে। সপ্তাহান্তে 'রিভিসন' এর অভ্যাস রাখো।

অন্যকে পড়াও

এটা খুব মজাদার পদ্ধতি। ঠিক খেলার মত। তুমি আজ যা পড়লে যা বুঝলে তা অন্যকে বোঝাও। তোমার পড়ার অংশ অন্যকে দিয়ে তাকে প্রশ্ন করতে বল আর তুমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর। এর জন্য একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। তা তোমার বাবা-মা, পরিবারের কোন সদস্য কিংবা তোমার কোনও সহপাঠী বা প্রতিবেশী বন্ধু হতে পারে। এক্ষেত্রে একই শ্রেণীর পড়ুয়া হলে উভয়েই উপকৃত হবে। এই প্রক্রিয়ায় পড়া করলে পড়াটা নিরস কোনও বাধ্যতামূলক বিষয় না হয়ে আকর্ষণীয় অভ্যাস হয়ে উঠবে। এই অভ্যাসে তোমার কোথায় দুর্বলতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি পরিশ্রম করতে হবে তা নিজেই অনুধাবন করতে পারবে।

বন্ধুর সঙ্গে পড়

অনেক সময় একা একা পড়তে বিরক্তি আসে। সেক্ষেত্রে বন্ধুকে নিয়ে পড়তে বসো। এতে একে অপরের অসুবিধাগুলো শেয়ার করতে পারবে, পরস্পরকে সাহায্য করতে পারবে। তাবলে গ্রুপ স্টাডি করতে যেও না। এতে সময় বরবাদ হবে।

বহু ধরণের টেস্ট পেপার অনুসরণ কর

পরীক্ষার কিছুদিন আগে থেকে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশ্নপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করো। এতে প্রশ্নের প্যাটার্ন যেমন জানতে পারবে তেমনি প্রশ্নপত্রের প্রতিটি সেকশনে কতটা সময় লাগতে পারে সে বিষয়েও তোমাদের একটা ধারণা তৈরি হয়ে যাবে। পরীক্ষায় বসার আগে তোমাদের আত্মবিশ্বাসটাও বেড়ে যাবে।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়াটা জরুরী

পরীক্ষার আগে যেন পরীক্ষার্থী সদা উচ্ছল ও স্বাভাবিক থাকে সেদিকে অভিভাবকরা খেয়াল রাখুন। খেয়াল রাখুন ওরা যেন অতিরিক্ত চাপ ও টেনশনে না পড়ে। এর জন্য দরকার উপযুক্ত নিউট্রিশন ফুড।

ঘরে তৈরি খাবার দিন। খিদে পেলে ড্রাইফ্রুট বা ফল দিন।

জিংক, ভিটামিন-বি এবং ভিটামিন-সি মানসিক চাপ ও চিন্তাকে কম করে।

পরীক্ষার সময় বাচ্চাকে একটু ভারী ও প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার দিন।

যে অভ্যাসগুলি করা উচিত

১) নাগাড়ে চার পাঁচ ঘন্টা একটানা পড়া উচিত নয়। প্রতি এক ঘন্টা অন্তর কিছু সময় বিরতি দেওয়া উচিত।

২) পরীক্ষা কাছাকাছি এসে গেলে স্মার্ট নোট তৈরি করে পড়া উচিত। এর অর্থ সব বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসগুলির একটা লিস্ট তৈরি করে নেওয়া।

৩) পরীক্ষার হলে প্রবেশ করার সময় বই পড়া উচিত নয়। পরীক্ষা শুরুর কিছু আগেই পড়া বন্ধ করা উচিত।

৪) শেষ মুহূর্তে কোন নতুন টপিকস্ পড়া উচিত নয়। এতে অনেকক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হতে হয়।

৫) প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সামগ্রী যেমন অ্যাডমিট কার্ড, পেন, পেনসিল, কম্পাস ইত্যাদি পরীক্ষার আগের দিন রাত্রেই গুছিয়ে রাখা উচিত।

৬) পরীক্ষা মানেই উত্তেজিত হওয়া নয়, মনকে যতটা সম্ভব শান্ত রাখা উচিত। এর জন্য ধ্যান ও প্রাণায়াম খুবই উপযোগী।

৭) সম্ভব হলে এক দু দিন আগে নিজের পরীক্ষাকেন্দ্রে পরিবেশটা ঘুরে দেখে আসা ভালো।

পরীক্ষার ক দিন কি খাবে

১) প্রোটিন মো বার্নার তাই শক্তি প্রাচুর্যে ভরপুর। খাবারে বেশি করে প্রোটিন গ্রহন কর।

২) ভিটামিন-বি ও সি যুক্ত খাবার খাও। যেমন মুগ, ডিম মাছ, ফল ইত্যাদি।

৩) প্রচুর পরিমাণে জল পান কর তাতে শরীরে হাইড্রেশন ভালো থাকবে। সঙ্গে দুধ বা শরবত।

৪) নিয়মিত ব্যায়াম কর।

৫) চা বা কফি পান বেশি করো না।

৬) দই, লেবু জল পান করতে পারো।

পরীক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে দূরে রাখতে অভিভাবকরা যা করবেন-

পরীক্ষা প্রস্তুতিতে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর রাখুন।

- বাচ্চা ৮/৯ ঘন্টা ঘুমের অবকাশ দিন।
- পরীক্ষা সময় সব বাচ্চাই কম বেশি চিন্তাগ্রস্ত থাকে। তা মাঝে মাঝে এদের মোটিভেট করুন।
- মোটিভেশনের জন্য বাচ্চার সঙ্গে 'পোস্ট এক্সাম প্ল্যান করুন।
- এনার্জি বুস্টআপের জন্য বাচ্চাকে হালকা ব্যায়াম করতে বলুন।
- পরীক্ষার প্রস্তুতি চলাকালীন মানসিক চাপ কমাতে কিছুটা করে সময় অবসর দিন যে সময়টা বাচ্চা গান শুনে বা খেলাধূলায় কাটাতে পারে।
- পড়ার সময় যেন সদর্থক ভাবনা নিয়ে পড়া করে এবং দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে পড়ে সেই দিকে নজর দিন।
- ১-২ মাস আগে থেকেই পরীক্ষার প্রস্তুতি যাতে শুরু হয় তা খেয়াল রাখুন। শেষ মুহূর্তের অনুশীলন হিতে বিপরীত হতে পারে।

ফ্যাট সম্যসার সমাধানে যোগচর্চা

শঙ্করশ্রী সুদীপ্ত বিশ্বাস (যোগ চিকিৎসক ও যোগ প্রশিক্ষক)

"বাড়তি চর্বি আপদ বালাই যদি না কমাও একে, নিজের অজান্তে নানা ধরনের রোগ আনবে ডেকে।" আপদ কিন্তু ঐ বাড়তি চর্বি, আর সেটা যদি আমাদের দেহকে আশ্রয় করে তবে সবদিকেই বেসামাল অবস্থা। তাই বলে বিপদ এড়াতে গিয়ে কিন্তু চর্বি বা ফ্যাট বিদ্বেষী হলে চলবে না। চর্বিকে একেবারে বাদ দিলে শরীরের কাজগুলে ঠিকঠাক হবে না। যোগা ফিজিক এ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সদ্য প্রয়াত সভাপতি বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়ের মতে -ফ্যাট ইজ দ্য ফুয়েল অব বডি।

তাই আমাদের কর্তব্য চর্বিকে নয় বাড়তি চর্বিকে বা মেদকে ঠেকিয়ে রাখা। কারণ ইংরাজীতে একটা ন্যায্য কথা আছে--- "ওবেটিসি ইজ দ্য মাদার অব অল ডিজিসেস"। কি এই ওবেসিটি? ওবেসিটি মানে হল শরীরের অপ্রয়োজনীয় চর্বি জমে যাওয়া। কি করে বোঝা যাবে যে চর্বি মাত্রা ছাড়িয়ে জমে আছে বা জমছে? আসলে আমাদের দেহের ওজনের শতকরা ১২ ভাগ চর্বি থাকা স্বাভাবিক। যখন কোন মানুষের বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী যা ওজন হওয়া উচিত, তার চেয়ে ওজন যদি ২০ শতাংশ বেশি হয়ে যায় তখন তার চর্বির আধিক্য হয়েছে বলা যাবে। এই প্রসঙ্গে বডিমাস ইন্ডেক্স বা বি.এম.আই-এর ওপর ভিত্তি করে কারোকে মোটা বা ফ্যাটবহুল বলা যায়। বি.এম.আই মাপার পদ্ধতি হল ব্যক্তির ওজনকে উচ্চতার বর্গফল দিয়ে ভাগ করা, আর যে ভাগফল হবে সেটাই হল বি.এম.আই। বি এম আই ১৮-২৫ এর মধ্যে হলে তাক মোটা বলা যাবে না, তিনি স্বাভাবিক। ২৫-৩০ এর মধ্যে হলে তিনি একটু মোটা। যাঁর বি.এম.আই ৩০-৩৫ তিনি মাঝারি ধরণের মোটা, ৩৫ এর ওপর হলে তিনি ভীষণ মোটা। যদি কোন ব্যক্তির ওজন ৫০ কেজি হয় আর উচ্চতা থেকে ১.৫ মিটার ওর বি.এম.আই হল -৫০/(১.৫)^2= ২০ অতএব এই ব্যক্তিকে মোটা বলা যাবে না কেননা এর বি এম আই-এর মাত্রা স্বাভাবিক রয়েছে।

আমাদের জানতে হবে ওবেসিটির শিকার হওয়া বা মোটা শরীরের মালিক হওয়ার কারণগুলো কি কি। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে যে শতকরা ৯০ ভাগ লোক মোটা হয়ে যায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া ও সেই সঙ্গে কম পরিশ্রম করার ফলে। বাকী শতকরা ১০ ভাগ মোটা লোকের ওবেসিটি হয় বংশগতির কারণে, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, পিটুইটারী গ্ল্যান্ড অথবা ডিম্বাশয়ের কোন কোন অসুখ থেকে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ থেকে। এছাড়া মানসিক অবসাদেও মেদ বা চর্বি বাড়তে পারে। মেদ বৃদ্ধির আরো কিছু কারণ থাকে। যাই হোক অপরিমিত হারে যদি মেদ বাড়তে থাকে তাহলে পরিণতিতে শরীরে যেসব বাড়তি অসুখ হয় তার একটা বিশাল তালিকা দেওয়া যায়। তার মধ্যে মোটামুটি হল অস্টিও আর্থারাইটিস, রিউম্যাটয়েড আর্থারাইটিস, গাউট, স্তনের বা জরায়ুর ক্যান্সার, লিভার, কিডনি, ওভারী প্রভৃতির ক্যান্সার, হাইব্লাডপ্রেসার, ব্লাডসুগার, গলব্লাডার স্টোন, হার্টের রোগ, অ্যাসিডিটি, চর্মরোগ, মানসিক রোগ প্রভৃতি। দ্য ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন পত্রিকার সতর্কবাণী অনুযায়ী যাদের বি এম আই ৩০-৩৪ তাদের লিভার ক্যান্সারে মৃত্যুর আশঙ্কা স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ। যাদের ৩৫ এর ওপরে তাদের আশঙ্কা চারগুণ বেশি।

এতরকম বিপদ ডেকে আনার উদ্যোগী যে মেদবৃদ্ধি বা ওবেসিটি তার বাড়বাড়ন্ত হয় কিভাবে সেটা আমাদের জানা দরকার। আমরা প্রতিদিন যেসব খাদ্য খাচ্ছি তার মধ্যে প্রধানভাবে থাকে শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ। এই সমস্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে যে ক্যালরি সঞ্চয় হয় সেই ক্যালরি আমাদের কাজ করার শক্তি জোগায়। আমরা যদি কাজ না করে বা কম কাজ করে সময় কাটাই তাহলে শরীরের ক্যালরি খরচ হয় না। তখন শরীরে স্নেহ পদার্থ সঞ্চিত থাকেই। এছাড়া প্রোটিন বা শর্করা থেকে তৈরী হয় স্নেহজাতীয় পদার্থ। এইভাবে সঞ্চয়ের নিরবিচ্ছিন্নতা চলতে থাকলে অচিরেই শরীরে মেদ বৃদ্ধি হয়। এই মেদ বা ফ্যাট শরীরের ভেতরে থাকা এক ধরণের কোষে সঞ্চিত হয়। এই কোষগুলো মেদ কোষ বা ফ্যাটসেল বলা হয়। মূলতঃ ফ্যাট সেলগুলো থাকে আমাদের ত্বকের নিচে 'সাবকিউটেনিয়া'নামে খুব পাতলা একটা স্তরের ঠিক নিচের অংশে, পেটের অন্ত্রের চারপাশে, হার্টের চারদিকে পেশীস্তরের মাঝের অংশে প্রভৃতি জায়গায়। শরীরের ফ্যাটসেলগুলোর মধ্যে ফ্যাট জমে থাকলে এই সেলগুলো প্রয়োজনে তিন-চারগুন আকারের বড় হয়ে যায় ও সুযোগ পেলে এরা সংখ্যাতে বেড়ে যেতে পারে। ভুঁড়িওয়ালা মানুষের ফ্যাট সেলের সংখ্যা ১ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩-৪ লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে। যদি কারো ফ্যাট সেল সংখ্যায় বাড়লো না অথচ সাইজে বেড়ে গেল প্রচুর, তখন তার বিপাকীয় ক্রিয়ার হার বা বেসাল মেটাবলিক রেট (বি.এম.আর) গন্ডগোল করতে শুরু করে। ভুঁড়ি যুক্ত পুরুষদের বৃদ্ধি দিন দিন কমতে থাকে। আমেরিকার ফ্লামির্হাম শহরে বিজ্ঞানীরা ৩০ বছর ধরে হাজার হাজার মানুষের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে সম্প্রতি এই তথ্য জানিয়েছেন। এছাড়াও বলা যায় যে মোটা মানুষ স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় অনেক বেশি রোগে ভুগবে ও তার মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক বেশি হয়।

চর্বিযুক্ত ভুঁড়ির আরো বিপত্তি আছে। ভুঁড়িযুক্ত মহিলারা সঙ্গমক্রিয়া করার সময় প্রকৃত যৌনসুখ থেকে অধিকাংশ সময়েই বঞ্চিত হন। কারণ এদের যৌন সুখের চরম অনুভূতি বা অর্গাজম অনেক সময়েই হয় না। ফল স্বরূপ তাদের সেক্স কনফিডেন্সও কমতে থাকে। যৌনসঙ্গীকে ঠিক মতো সুখী করতে পারেন না। ভুঁড়িওয়ালা পুরুষদের শুক্রাণুসংখ্যা কমতে থাকে। ফলে অনেক সময় তারা সন্তানের জন্ম দিতে অসক্ষম হন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে মেদ বা স্নেহ অতিবিষম বস্তু। একে নিয়ে এত জটিল সমস্যা দেখে শুনে ১৯৯৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওবেসিটিকে

(সাতের পাতায় দেখুন)

Scanned by CamScanner

সম্পাদকীয়.....

নাগাড়ে ভাগাড়ের মাংস নিয়ে আলোচনা চলছে, সরকারি তরফে 'অতি তৎপরতার' অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তবে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হবার পর 'দাউদাউ' থেকে 'হিমিত' শেষে 'নির্বাপন' হওয়ার মত ভাগাড়ের মাংস নিয়ে তোলপাড় আলোচনা, সোসাল মিডিয়ায় রসালো 'চুটকি' এইভাবেই হিমিত হয়ে এক সময়ে শেষ হবে। সংবাদ মাধ্যম তখন অন্য 'খোরাক' এর অন্বেষণ করবে কিন্তু শেষ হবে না মানুষের অভ্যাস। কিছুদিনের মধ্যেই মানুষ হোটেল মুখো হবে, মাংস বিক্রেতা তথা হোটেল মালিকরা মন্দা কাটিয়ে আবার রমরমা ব্যবসা ও লাভের মুখ দেখবেন। এটা আমাদের অভিজ্ঞতাই বলছে। নিকট অতীতে আমরা দেখেছি একটি আন্তর্জাতিক নামি সংস্থার নুডলস নিয়ে 'হুলস্থুল' হয়ে গেল, বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালো। সেই সংস্থা পরোক্ষ ভাবে নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে অবশিষ্ট 'বিষ' নুডলস্ বিনষ্ট করে ফেলল এবং মানুষের সাধুবাদ কুড়ালো। বিশেষ এই নুডলস থেকে অভিভাবকরা সাময়িক মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্য বলে কথা। কারণ এই নুডলস বাচ্চাদের কাছে বেশি জনপ্রিয়। কিন্তু তা সাময়িক, কিছুদিন পরেই এই সচেতন অভিভাবকদের শিশুদের নিয়ে 'স্বাস্থ্য ভাবনা' ঐ সংস্থার কাছে 'আত্মসমর্পন' করল। সংস্থাটি নতুন কদমে আবার তাদের এই বিশেষ পণ্যটি বাজারজাত করল এবং দাবি রাখল একশ শতাংশ বিশুদ্ধির। ব্যাস। অভিভাবকরাও তাদের পুরানো অভ্যাসে হৈ হৈ করে ফিরে গেলেন। শিশুদের মুখেও হাসি ফিরে এল। ভুলে গেলে চলবে না আমরা 'টিপিক্যাল বাঙালী'। মা ঠাকুমার যুগের সাবেকিয়ানা, খাদ্যাভ্যাস এক লহমায় ত্যাগ করতে পারি কিন্তু নিজেদের 'আধুনিক' অভ্যাস কি করে ত্যাগ করি আর কি করেই বা সন্তানদের ত্যাগ করতে বলি। 'বিষ' সেতো অমর। সে নিজে মরে না অন্যকে মারে। সুতরাং 'বিষ' তুমি আমাদের কাছে দিনে দিনে আরও প্রভাবশালী হও আর 'ভেজাল' তুমি দীর্ঘজীবি হও। তোমাদের বাজার নিদিষ্ট থাকবেই।

জেনে রাখলে ক্ষতি কি?

গ্রীষ্মে শুধু ঠা-ঠা রোদে ঘুরলেই সান স্ট্রোক হবার আশঙ্কা থাকে এমনটা নয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে দীর্ঘ সময় কাটানোর পর হঠাৎ রোদে বের হলেও এমনটা হতে পারে। শরীর সেই মুহূর্তে শীতল ও অতি উষ্ণতার মধ্যে পড়ে যায়। লীন তাপের দ্রুত হের ফের ঘটার ফলে শরীরের জল দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে জল শুন্যতা দেখা দিয়ে অক্সিজেনের ঘাটতি তৈরি করে যা হিট স্ট্রোক বা সানস্ট্রোকের বিপদ ডেকে আনতে পারে।

* *মেডিটিপস

প্রঃ আমার মেয়ে (১৭ বছর)র ইদানীং এক অভ্যাস দাঁড়িয়েছে সারাক্ষণ সেলফি তোলার। দিনের অনেকটা সময় এতে নষ্ট করছে। ফলে পড়াশুনা ও অন্যান্য কাজে ঢিলেঢালা ভাব এসে গেছে। খুব চিন্তায় আছি।

- পিউ ঢালি, বাঁকুড়া

উঃ আজকের দিনে এটি এক গভীর সমস্যায় রূপ নিতে চলেছে। এই সেলফির কারণে ২০১৪-২০১৬ পর্যন্ত ১২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এটা অ্যাডিকশনের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়ে সেলফি তুলুক কিন্তু যেন সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট না করে। মেয়েকে বলুন ক্যামেরায় নিজেকে অহরহ দেখা বন্ধ করতে। এধরণের অভ্যাস মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে। ওকে বোঝান দিনে তিনবার করে সেলফি তোলার অর্থই হোল তুমি মানসিক ভারসাম্য হারাতে বসছো। আজকের বিশেষজ্ঞদের মত হল সেলফি, কিলফি হয়ে যেতে পারে। ওকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে অহরহ পরামর্শ দিন কিন্তু চাপ সৃষ্টি করবেন না।

* * প্রিয় সম্পাদক * *

সমাজ কখনই স্থিতিশীল নয়, সদা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন কখনও ধীরগতির কখনও বা দ্রুতগতির। সময়ের নিরীখে এই পরিবর্তনের সঙ্গে আমরা মানিয়ে নিই বা মানিয়ে নিতে বাধ্য হই। আর একেই আমরা 'জীবন' বলি। কিন্তু যা সমাজের অবক্ষয় ডেকে আনে তাকে ত্বরান্বিত করে সেই কি জীবন নাকি শুদ্ধ ও বাস্তবতার সাবেকিয়ানাকে ঠিক রেখে কেবলমাত্র অবস্থা ও অবস্থানের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে পরিবর্তনকে আহ্বান জানায় সেটাই জীবন। আজ পরিণত বয়সে এসে প্রপিতামহ, পিতামহ তথা পিতৃকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নিজেকে গড়ে সমাজের বোঝা হয়ে যাইনি। সমকালীন আমরা কিন্তু আজ যে পরিবর্তন দেখছি, তা কি জীবনের মূল খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের জাগরণ ঘটাচ্ছে না? যেখানে জীবনের মৌলিকতা নেই, পরিবর্তে স্থান নিয়েছে 'মেকি আধুনিকতা আর বেহিসেবি, উদ্ভত জীবনবোধ' যা সমাজে পচন ধরিয়েছে, সেই পচন ক্রিয়া এগুচ্ছে দ্রুতগতিতে। এরপর কী? সমাজকর্মীরা ভাবুন।

-মৃণাল কর, কোন্নগর, হুগলী।

দ্রব্যগুণ

এখন গ্রীষ্ম। তাই শারীরিক সমস্যাও অনেক দেখা যায়। চিকিৎসকের কাছে আনাগোনাও বেড়ে যায়। আজ কিছু ঘরোয়া দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করব যা গ্রীষ্মের সাধারণ অনেক সমস্যার সমাধান করবে।

১) হাত- পা জ্বালা ঃ- পুদিনা ও ধনেপাতা সমপরিমাণ বেটে হাত পায়ে লেপন করলে হাত পায়ের জ্বালা কমবে। পরিবর্ত হিসেবে মেহেদিও একই ফল দেবে।

২) সারা শরীরে জ্বালাবোধ ঃ- কাঁচা পেঁয়াজের রস লাগালে তুরন্ত আরাম দেবে। ছাগলের দুধও সমান উপকারি, পেপে বাটা মাখলেও জ্বলুনি কমবে। পাকা তেঁতুলের কাথ একই রকম উপকারি।

৩) সর্দি ও নাক দিয়ে জল পড়া ঃ- সরষের তেলে সেই পরিমাণ লবণ দিন যাতে তেল না গড়ায়। এরপর ঐ তেল হাত পায়ের নখে এবং কপালে লেপন করুন। উপকার পাবেন। তুলসীর রস মিছরি সহযোগে খেতে পারেন।

৪) লু লাগলে ঃ- লু লাগলে একটি কাঁচা আম সেদ্ধ করে সেঁকে নিন। তারপর এটিকে কিছুক্ষণ ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখুন, এরপর খোসা ছাড়িয়ে শাঁসটি চটকে গুড়, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লবণ ও গোলমরিচ মিশিয়ে (প্রয়োজনমত) পরিমাণমত জল দিয়ে সরবত করে পান করলে (দিনে ২/৩ বার) আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়, লু লেগে জ্বর এলে তেঁতুল সেদ্ধ করে সরবত করে খেলে জ্বর কমে যাবে। পেঁয়াজের রস কানপাটি ও বুকে লেপন করলে লু এর তাপ কমে যাবে। আলু বোখরা গরম জলে ভিজিয়ে চটকে নিয়ে সরবতের মত পান করলে লু এর প্রভাব কমবে, নারকেলের দুধে কালো জিরে বেটে গায়ে মাখলে শরীরের জ্বালা জুড়াবে, ধনে পাতা বাটা ও চিনি মিশ্রিত সরবত খেলে লু এর প্রভাব কমবে।

ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও মনের সুস্থতা

ডঃ প্রভাকর ভট্টাচার্য

ঐতিহ্য সংরক্ষণের হিড়িক পড়ে গেছে। ভাঙ্গাচোরা ঘরবাড়ি দেখলেই দাবী উঠছে সরকারী খরচে পূর্বাবস্থায় ফেরিয়ে আনার। বাড়ির মালিকরাও কম সেয়ানা নয়, তড়িঘড়ি সরিকি বিবাদ মিটিয়ে প্রোমোটার ডেকে চুক্তি। দুবছরের মধ্যেই নতুন ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশ।

'ঐতিহ্য' বলতে অনেকেই পুরোনো 'ঘরবাড়ি' 'মন্দির-মসজিদ গীর্জা' মিনার- তোরণ ইত্যাদি বোঝেন। সংস্কৃত শব্দ 'ইতিহ' এর উত্তর 'য' প্রত্যয় যোগে 'ঐতিহ্য' শব্দটি বুৎপন্ন। এর আক্ষরিক অর্থ পরম্পরায় চলে আসে এমন বস্তুত সম্পদ তেমনি পরম্পরাগত চিন্তা বিশ্রুতি, সংস্কার, ভাবধারা, অভ্যাস প্রথা মূলত ভাবসম্পদ।

সংস্কৃত শুধু সেকেলে নয় অনেকের মতেই সাম্প্রদায়িক। আমরা বাংলা 'ঐতিহ্য' শব্দটিকে ইংরেজি শব্দের সমার্থক মনে করি। এই 'Heritage' শব্দটা আবার খাটি ইংরেজি শব্দ নয়, এসেছে পুরোনো ফরাসী শব্দ 'Heriter' থেকে যার মানে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

জন্মসূত্রে যেসব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা এবং মালিকানা প্রাপ্তি ঘটে সবই ঐতিহ্য। অনেক সময় 'Heritage' এবং 'Tradition' কে প্রায় সমার্থক করে দেখা যায়। এই অর্থে প্রবাহমান কাল ধরে চলে আসা প্রথাগুলি সবই ঐতিহ্য। শুধু মানুষের তৈরী মূর্তি বা সৌধ নয়, আবহমান কাল ধরে বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত পাহাড়, পর্বত, হ্রদ, নদী, সরোবর সবই ঐতিহ্য হতে পারে, যা সংরক্ষণের দাবীদার। তাজমহল, সাঁচী স্তুপ যেমন ঐতিহ্য, হিমালয়, মানস সরোবর, জর্ডন কিংবা গঙ্গানদীও তেমনি ঐতিহ্য। আসলে ঐতিহ্য আমাদের মধ্যে এক ধরনের স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত করে, ঐতিহ্য ধারক ও বাহক বলে গর্ববোধ হয়।

'ঐতিহ্য' হিসাবে স্বীকৃত হলেই তা আপামর মানুষের কাছে শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রমের বিষয় হবে এমন কোন কথা নেই। একজনের কাছে যা ' যে কোন মূল্যে সংরক্ষণযোগ্য অতিহ্য' আরেকজনের কাছে তা 'সভ্যতার কলঙ্ক'। যত তাড়াতাড়ি সে আপদ যায়, ততই জগতের মঙ্গল। তাই দু হাজার বছরের পুরোনো 'বামিয়ান বুদ্ধ' মূর্তিটি ভাঙ্গতে পেরে থালিবানদের এত গর্ব।

কারো কাছে কোনো কিছু মূল্যবান বলে বোধ হলে তবেই তা অতি যত্নে সংরক্ষণের চেষ্টা করে। আর একটা কথা, ঐতিহ্য কিন্তু যখের ধনের মত লুকিয়ে রাখার মত একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। জনসমষ্টির স্বীকৃতি ছাড়া কোনো কিছু 'ঐতিহ্য' হয়ে ওঠে না। এই সমষ্টি একটা পরিবারের কয়েক প্রজন্ম হতে পারে, আবার হতে পারে একটা গোটা দেশের বা তামাম বিশ্বের জনগণের।

মূল্যবান হলেই যে তা সবসময় অর্থমূল্যে বিচার্য হবে এমন কোনো কথা নেই। ধর্মীয় ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে অর্থমূল্যের সবসময় সমানুপাতিক সম্পর্ক থাকবে এমন কোনো কথা নেই। অমরনাথ মন্দিরের ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে, দক্ষিণভারতের মন্দিরের আর্থিক সমৃদ্ধির সাথে তুলনা করা চলে না কোন মতেই।

তবে বাজার অর্থনীতির যুগে ঐতিহ্য সংরক্ষণের হিড়িকের পেছনে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ। পর্যটন শিল্পের বিকাশের সঙ্গে ঐতিহ্যের যথাযথ সংরক্ষণ ও বিপণনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। রোম, গ্রীস, মিশর বা মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ পর্যটক ভিড় করে ঐতিহ্যের নির্দশন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার লোভে। কোটি কোটি টাকার লেনদেন অর্থনীতিকে করে সমৃদ্ধ।

মূল্য ব্যবহারে কমে। অনেকসময় অব্যবহারে ফেলে রাখলেও কমে। যেমন হাজার টাকা দিয়ে কেনা এক সেট পোশাক দশবার ব্যবহারের পর স্বাভাবিকভাবেই সেটির মূল্য অনেকটা কমে যাবে। আবার ঐ পোশাকটির ব্যবহার না করে দশ বছর ফেলে রাখলেও তার মূল্য ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে। পোশাকটি যদি অযত্নে থাকে তবে দশবছর বাদে সেটির ব্যবহার যোগ্যতা অনেকটাই কমে যাবে। আবার অতি যত্নে সংরক্ষিত থাকলেও ফ্যাশান অপ্রচলিত হয়ে যাওয়ার কারণে পোশাকটির, ব্যবহার্য পোশাক হিসাবে মূল্যও অনেকটাই কমে যাবে। কিন্তু সংগ্রহণযোগ্য দ্রব্য বা Collectors item হিসেবে মূল্য বেড়ে যেতেও পারে।

সোনাদানা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর মূল্যের কমাবাড়া ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না, করে বাজার এর উপর। চাহিদা যোগানের বাড়া কমার সাধারণ নিয়মও মহার্ঘ্য ধাতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদিও আমদানি রপ্তানি খনিজ উত্তোলন ও পরিশুদ্ধকরণ এবং সর্বোপরি দেশের সরকারের শুল্কনীতি মূল্যবান ধাতুর মূল্য বাড়া কমার জন্য অনেকটা দায়ী।

বিদ্যার মূল্য ব্যবহারে কমে না বরং বাড়ে। একটি প্রাচীন শ্লোকে আছে " অপূর্বঃ কোঽপি ভান্ডারঃ তব ভারতী দৃশ্যতে ব্যয়ত বৃদ্ধিমায়াতি ক্ষয়মায়াতি সঞ্চয়াত" অর্থাৎ বিদ্যার দেবী ভারতী বা সরস্বতীকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, তার ভান্ডারটি এমনই অপূর্ব যে ভান্ডার খরচ করলে বেড়ে যায় আর খরচ না করে জমিয়ে রাখলে কমে যায়। ব্যবহার-এ মূল্য কমে এই কথাটি বিদ্যাভ্যাস বা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়।

জ্ঞান -বিজ্ঞান বিদ্যা, জ্ঞান- বিজ্ঞান চর্চার উপকরণ বইপত্র এগুলির মূল্যের ণ্ঠানামা অনেকরকম শর্তের উপর নির্ভর করে। মূল্যবান জিনিসের সমঝদার না হলে যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। একজন একটি মহামূল্যবান রত্ন নিয়ে গিয়েছিল এক সবজিওয়ালার কাছে, সে নেড়েচেড়ে দেখে বলল পাথরটি তো বেশ। আমি এর বদলে তোমাকে পাঁচকিলো বেগুন দিতে পারি। অনেক জায়গা ঘুরে যখন সেই ব্যক্তি মণিমুক্তোর দোকানে দেখাল তখন শুনল যে, ঐ পাথরটির মূল্য লক্ষাধিক টাকা।

বাংলা ভাষার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা, তার পুঁথিটি পাওয়া গিয়েছিল একজন সম্পন্ন গৃহস্থের গোয়ালঘরে। যথাসময়ে তালপাতার পুঁথিটি বিশেষজ্ঞের হস্তগত না হলে গরুর জাবের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দেখয়া হত কী না কে বলতে পারে। আগে বাড়িতে এককোনে বা ছাদের উপর ঘেরা একটু জায়গা থাকত যেখানে এমন সব অব্যবহার্য জিনিসপত্র রাখা হত যেগুলি সারিয়ে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে নেওয়া সম্ভব নয়। অথচ সেই

সাতের পাতার দেখুন

Scanned by CamScanner

মেডিক্যাল কলেজে থ্যালাসেমিয়া দিবস

দীপক মুস্তাফী ঃ ৮ মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস। এ উপলক্ষ্যে সারা দেশেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। ব্যতিক্রম হয় নি কোলকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল রক্তদান শিবির, সন্ধ্যা যোগ মেমোরিয়াল হলে ৫৬ জন রক্তদান করেন। মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাংক ঐ রক্ত গ্রহন করে। প্রফেসর মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে নার্স, কর্মী, মেডিক্যাল স্টুডেন্ট, রোগীর বাড়ির পরিবারও রক্ত দেন। ১১ মে কলকাতার শহীদ মিনার থেকে একটি র‍্যালি মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত যায়। র‍্যালিতে অংশ নেয় কোলকাতার বিশিষ্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রশেসনের অঙ্গভাবে পদযাত্রায় সামিল হন সংগীত শিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া, অভিনেতা হাজি আবদুল নুর। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ড. রামানুজ সিনহা, ডাঃ নির্মল মাঝি, প্রফেসর মৌসুমী নন্দী, প্রফেসর মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য, ডাঃ স্বর্ণলতা রায়, প্রমুখ ব্যক্তি। র‍্যালিতে অংশ নেয় প্রায় ৬০ জন থ্যালাসেমিয়া রুগী। বিভিন্ন স্ট্যাচু, ট্যাবলো, ব্যানার, প্লাকার্ড নিয়ে এই প্রশেসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল থ্যালাসেমিয়ার জনসচেতনতা বৃদ্ধি। পরে হলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে চলে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন উত্তর পর্ব। হিমাটোলজি ডিপার্টমেন্টের আয়োজনেই মূলত অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। গত ১৮ মে এ্যাকাডেমি বিল্ডিং অডিটোরিয়ামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানহয় যাতেঅংশ নেয় থ্যালাসেমিয়া রুগী ও অন্যান্য শিল্পীরা। হল ভর্তি ছিল থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে IMA & RYCS এর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা উপলক্ষ্যে স্লোগান হল " হেলথ ফর অল" একথা মাথার রেখে বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্নভাবে উদ্যোগ নিয়েছে। স্বাস্থ্যই সম্পদ ওটা আর একবার ভালো করে মনে করিয়ে দেবার জন্য। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোশিয়েশন এর শ্রীরামপুর শাখা ও শ্রীরামপুর রাজদীপ যোগা এ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি (RYCS) শ্রীরামপুর হাইস্কুলে এ বছরের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস (৭ এপ্রিল) এ স্বাস্থ্য সচেতনতা ভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তাতে অংশ গ্রহন করেছিল ঐ স্কুলের প্রায় ২০০ জন ছাত্রী। শিক্ষিকাদের মধ্যেও অধিকাংশই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই RYCS এর জনসংযোগ সচিব শিক্ষয়ত্রী রেবা মুখার্জী বিশ্বাস একটি বিশেষ পদ্ধতিতে উপস্থিত সমস্ত ছাত্রীদের ডিপ ব্রিদিং অনুশীলন করান। উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রীদের তাৎক্ষনিক মানসিক অস্থিরতা কাটিয়ে ধীর স্থির বক্তব্য ও যোগ প্রশিক্ষক যাতে তারা আরও করতে পারে। ছাত্রীরা নিজেদের স্বাস্থ্য নিজেরা কিভাবে ভাল রাখতে পারবে। কেন ভাল রাখা দরকার, এ বিষয়ে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কি কর্তব্য এসব বিষয়ে খুব সহজ করে বুঝিয়ে বক্তব্য রাখেন আই এম এ শ্রীরামপুর শাখার সভাপতি প্রখ্যাত সমাজসেবক বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রদীপ কুমার দাস এভং বিশিষ্ট যোগ ও ফিজিওথেরাপিস্ট RYCS -এর প্রতিষ্ঠতা সম্পাদক শঙ্করশ্রী সুদীপ্ত বিশ্বাস। এর পরে বিভিন্ন যোগাসন প্রদর্শন করে ও ফ্রী হ্যান্ড এক্সারসাইজ করে দেখান শ্রী বিশ্বাস এর ছাত্র সুরজিৎ মুখার্জী। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে প্রায় সমস্ত ছাত্রীরাই শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঐ স্কুলেরই শিক্ষিকা মীনাক্ষী আচার্য। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে আর ওয়াই সি এস এর পক্ষ থেকে সমস্ত শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় কিছু ছাপানো কাগজ যাতে ছিল স্বাস্থ্য বিষয়ক নানা মূল্যবান পরামর্শ।

বীরভূমের নবম শ্রেণির এক ছাত্রী এক অভিনব সিদ্ধান্ত

বীরভূমের মহম্মদ বাজারের প্রত্যন্ত গ্রাম রানিতুরের সোনালি হেমব্রম এক অভিনব সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গিরিপুর পুরাতন গ্রাম বি.এন.হাই স্কুলের নবম শ্রেনির এই ছাত্রী ধর্মের নামের বজ্জাতির প্রতিবাদে সরব হয়ে এক দারুণ কান্ড ঘটিয়েছে। স্কুলের ভর্তি হওয়ার ফর্মে ধর্ম লেখার স্থানটি ফাঁকা রেখে আধুনিক সমাজকে এক অন্য বার্তা দিয়েছে এই ছাত্রীটি। অভাবী মার সঙ্গে কাজের খোঁজে মেয়েটি পাড়ি দিয়েছিল ভিনরাজ্যে। লেখাপড়ার পাট প্রায় চুকে গিয়েছিল। ভিনরাজ্যে কয়েক মাস কাটিয়ে ফিরে আসে মহম্মদবাজার ব্লকের রানিপুরের গ্রামের বাড়িতে। নতুন করে পড়াশুনা শুরু করতে গিয়ে স্কুলের তরফ থেকে দেওয়া হয় একটি ফর্ম। যেখানে নিজের ধর্ম লেখা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ফর্মে সব কিছু লিখে ধর্ম লিখতে গিয়ে ফাঁকাই রেখে দেয় সোনালী। আশার কথা ,স্কুল কর্তৃপক্ষ সেনালীর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে।

নারীর আইনি অধিকার নিয়ে আলোচনা সভা

গত ৩০ মার্চ বালির পাঠকপাড়ার শ্রমজীবী পাঠশালায় আয়োজিত হয় এক আন্তর্জাতিক কর্মশালা। শ্রমজীবী হাসপাতাল আয়োজিত এই কর্মশালার বিষয় ছিল 'ব্যক্তি সত্তার বিকাশ ও নির্যাতন প্রতিরোধে নারীর আইনি অধিকার।' এই আলোচনা সভায় ঢাকার মনোবিদ রেজিনা পারভিনের কথায় উঠে এল সে দেশের নারীর ব্যথাদীর্ণ মুখ। এ দেশ যখন সংখ্যালঘু নারীর তিন তালাক নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত, বাংলাদেশে সেই সংখ্যালঘু নারীর সেই বিবাহ পরবর্তী অধিকারের জোর। সেদেশে হিন্দু মেয়ের বিয়ে নথিভুক্ত করা আজও বাধ্যতামূলক নয়। ঢাকা আদালতের আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী নাহিদ শামস্ বলেন যে, মেয়েরা সব দেশেই বড় অবহেলিত। নিজের জন্য লড়ার অধিকারটুকুও দেয় না সমাজ। এই দিনে নাটাদল বাতায়ন শ্রুতি নাটক পরিবেশ করে। প্রকাশিত হয় শ্রমজীবী হাসপাতলের শ্রমজীবী কথা'র তৃতীয় সংস্করণ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে চিকিৎসা ব্যয়ে নিঃস্ব ১০ কোটি মানুষ

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এবং বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রতি বছর ১০ কোটিরও বেশি মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে পড়েন যাঁরা চিকিৎসার ব্যাপক ব্যয়ভার বহন করতে ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিতে বাধ্য হন। সমীক্ষায় প্রকাশ, ৮০ কোটি মানুষের পারিবারিক বাজেটের প্রায় ১০ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে অপরিকল্পিতভাবে ব্যয় হয়। এঁদের অধিকাংশ স্বাস্থ্যবিমা রয়েছে, কিন্তু এই ১০শতাংশ খরচ বিমার বাইরে অতিরিক্ত খরচ। এশিয়ার ৭২ শতাংশ মানুষ তাদের পারিবারিক বাজেটের ২৫ শতাংশ অপরিকল্পিত চিকিৎসা খাতে খরচ করেন। গরিব পরিবারে মাত্র ১৭ শতাংশ মহিলা গর্ভবতী অবস্থায় বা বাচ্চার জন্মের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিষেবা পান, সেখানে ধনী পরিবারে তা ৭৪ শতাংশে।

জল সঞ্চয় করে আদর্শ গ্রামের শিরোপা

ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর জেলার প্রান্তিক গ্রাম বিটকুলি সম্প্রতি 'আদর্শ গ্রাম'-এর তকমা পেয়েছে এই গ্রাম। ২০০৮ সালে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'শিখর যুব মঞ্চ'-এর সঙ্গে মিলে নিজেদের উদ্যোগে জলসংরক্ষণ প্রকল্প শুরু করার উদ্যোগ নেন গ্রামবাসীরা।

তীব্র জলকষ্টের শিকার ছিল এই গ্রাম। মোট ২৫৫ একর চাষযোগ্য জমির মধ্যে মাত্র ১৩০ একরে চাষ আবাদ সম্ভব হত। তাও শুধুমাত্র বর্ষাকালে, অন্য সময়ে কাজের খোঁজে বাসভূমি ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হতেন গ্রামবাসীরা। এলাকায় জলসেচের একমাত্র উৎস ছিল ধরমনগর নামে একটি পুকুর। ধরমসাগর থেকে চাষের মাঠে জল সরবরাহের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বয়ে আনা জলে মাত্র ৬০ একর জমিতে চাষ সম্ভব হত। অবস্থা বদলাতে শিখর যুব মঞ্চের সাহায্য নিয়ে আসরে নামেন গ্রামবাসীরা। প্রথমে ধরমসাগরের গভীরতা বাড়ানো হয়। সেই পুকুর থেকে জল সরাসরি জমিতে নিয়ে আনার জন্য বেশি কিছু খাল কাটা হয়। এমন অবস্থাও করা হয় যাতে পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির জল সোজা ধরমসাগরে এসে জমা হয় এখানে থেমে না থেকে গত পাঁচ বছরে আরও দুটি বড় দিঘি ও ৯ টি খামার পুকুর খনন করেছে গ্রামবাসীরা। রোধ হয়েছে ভূমিক্ষয়। অনিবার্যভাবে বেড়েছে জমির জলধারণ ক্ষমতা ও উর্বরতা। বিটকুলিতে এখন বছরে দুবার চাষ হয়। বর্তমানে প্রতি একর জমিতে ফলনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে গড়ে ৪-৬ কুইন্টাল। তৈরি হয়েছে অনেকগুলি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। সম্প্রতি মাছ চাষও শুরু হয়েছে। সে দিনের ছন্নছাড়া বিটকুলি এখন আদর্শ গ্রাম।

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা ঃ ২২৯

আলোচনাঃ কলকাতার জলাভূমি

সীতাংশু কুমার ভাদুড়ীঃ সম্প্রতি ইনস্টিটিউট অফ হিসটোরিক্যাল স্টাডিজ আয়োজিত এক সুরক্ষনিয়াম স্মারক বক্তৃতায় 'ঐতিহাসিক নাগরিক রাজনৈতিক বাস্তু বিজ্ঞান-এর দৃষ্টান্ত রূপে কলকাতা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আই আই টি, খড়গপুরের কলা ও সমাজবিজ্ঞান শাখার সহকারি অধ্যাপিকা ডঃ জিনিয়া মুখার্জী। বক্তা বলেন যে, জলাভূমি মানব সভ্যতার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জলাশয়কে রক্ষা করা আমাদের সকলের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমাদের পরিবেশ উন্নত হবে না যদি না আমরা সচেতন হই এবং জলাভূমি সংকোচনের অপচেষ্টায় প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি। মানব কল্যাণে জলাভূমি বাঁচাতেই হবে। বক্তার উপস্থাপনায় কলকাতার জলাভূমি রক্ষার বর্তমান অবস্থা ও তার রূপ বিস্তারিতভাবে ফুটে ওঠে। কলকাতার পূর্বদিকে অবস্থিত অনেকগুলি ছোটোবড়ো ভেড়ি ও চাষের জমির সমাহারকে বলা হয় পূর্ব কলকাতা জলাভূমি। কলকাতার পূর্বদিকের বিস্তীর্ণ এলাকাজোড়া নোনা জলের অঞ্চলটি ছিল জোয়ার ভাঁটা খেলা বিদ্যাধরী নদীর প্লাবন অঞ্চল, ২০০২ সালে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ পূর্ব কলকাতার জলাভূমি এখন রামসার তালিকায় 'আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি' বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই জলাভূমি পরিচালনার জন্য পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) আইন ২০০৬ অনুসারে 'ইষ্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি' সংস্থা গঠিত হয়েছে। বক্তা শেষে বলেন যে, কলকাতার পরিবেশকে ভালো রাখতে এই জলাভূমির সংরক্ষণ খুব জরুরি। এগুলিকে বুজিয়ে যাতে শহর বসানো না হয় সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। এই দিনের স্মারক বক্তৃতার সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপিকা সুতপা চ্যাটার্জী সরকার। সমগ্র আলোচনা পর্বটি পরিচালনা করেন আয়োজক সংগঠনের অধিকর্তা ডঃ চিত্তব্রত পালিত।

প্রতিষ্ঠা দিবসে স্বাস্থ্যপরিষেবা

ডাঃ পাগোবি, হাবড়া ঃ এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ১৫৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে হাবড়া শাখা গ্রাহকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। হাবড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (হাবড়া হাসাই) এর সহযোগিতায় ১০ জন প্রবীণ ৪ জন প্রবীণা সহ ৮০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পরে হাবড়া শাখার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

মা'র জন্য রক্তদান

সীতাংশু কুমার ভাদুড়ীঃ কলকাতার বিভিন্ন সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি যৌথভাবে গত বছর ২০১৭ সালে সৃষ্টি করে ফোরাম ফর দুর্গোৎসব। ২৩৬ টি কমিটি এই ফোরামে যোগদান করে আয়োজিত করে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত ৪ জুন ২০১৭ রক্তদান শিবিরে মোট ৮০১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই বছর গত ৬ মে রক্তদান শিবিরে ১৫৬২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই রক্তদান শিবিরের নাম মা'র জন্য রক্তদান। এই বছরে ২৯৫ টি দুর্গোৎসব কমিটি সামিল হয়েছেন। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে প্রত্যেক রক্তদাতাকে একটি ভি আই পি কার্ড দেওয়া হয়। যার বিনিময়ে ২০১৮ সালে ৪ জন একসাথে দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে বিশেষ মর্যাদায় ২৯৫ টি পুজো মন্ডপে প্রতিমা দর্শন করতে পারবেন।

শ্রাদ্ধে রক্তদান

পাকস্থলীর ক্যানসারে ২০ মার্চ মৃত্যু হয় পাঁশকুড়ার শাহড়দার বাসিন্দা ভোলানাথ পতির। বাজারহাটের এক বেসরকারি হাসপাতালে গত অক্টোবরে তাঁর ক্যান্সার চিকিৎসা শুরু হয়, প্রথম কেমোথেরাপির পর রোগীর রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ক্রমশই নামতে থাকে। পাঁশকুড়ার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় স্থানীয় কুমোরপুর, হটেশ্বর হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ভোলানাথবাবুর। ৬৮ বছরের এই মানুষটিকে রক্ত দেওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু তমলুক জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত না পেয়ে হতাশ হন ভোলানাথবাবুর পরিবার। পরে তাঁরা হাসপাতালে 'বেড টু বেড' রক্ত দিয়ে পরিস্থিতি তখনকার মতো খানিকটা সামাল দেন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। ভোলনাথবাবুর প্রয়ানের পর তাঁর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অনুষ্ঠানে দুই প্রক্রিয়া মিশে গিয়ে এক অন্য পরিমন্ডল গড়ে তোলো। যা এক নতুন দিশা তুলে ধরে।

ডঃ নরেশ চন্দ্র দত্ত প্রয়াত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের প্রাণীতত্ত্বের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ নরেশ চন্দ্র দত্ত গত ১৯ মার্চ প্রয়াত। বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞান প্রচারক এই মানুষটি মানুষের মধ্যে অন্ধ কুসংস্কার দূর করার জন্য সারা জীবন কাজ করে গেছেন।

Scanned by CamScanner

সাপমুক্তি

শুভ্র গোস্বামী

পন মোল্লা হন্তদন্ত হয়ে মেঠো রাস্তা দিয়ে প্রায় দৌড়তে াগল। রাত তখন প্রায় সোয়া তিনটে। বীরভূমের শিমাঞ্চলের একটি গ্রামে রাতের ওই সময়ে হঠাৎ দুসংবাদে াস যেন চলতে ভুলে গেছে। হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে পন এসে কড়া নাড়লো বন্ধু সতে মালিকের মাটির বাড়িতে। শ্ব জ্বালিয়ে ঘুম জড়ানো চোখে তপনকে দেখে হকচকিয়ে ালো সতে। পিছনে পিছনে সতের বৌ লক্ষীও বেরিয়ে সেছে। সতের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে ক্ষেত মজুর পন বললো, মেয়েকে কালে কেটেছে (কামড়েছে)। কি রি বলতো? ওঝার কাছে যাবো, না হাসপাতালে, তুই কি লিস? হাঁ করে তাকিয়ে রইলো সতে তপনের বলিষ্ঠ শরীর স্তু ঝুলে যাওয়া মুখের দিকে।

তে শুধু বললো, আগে তো তোর বাড়ী যাই চল। তারপর ার পাঁচজনে কি বলে দেখি তবে মনে হয় হাসপাতালে য়ে যাওয়াই ভালো। দেখলিতো গত মাসে হরে মাঝির াকে ওঝার কাছে নিয়ে গিয়ে কোন ফল হলো না। ইখানেই ঢলে পড়লো। তোর মেয়ে সবে তেরো। ওরা ার কথা না বলে টর্চ জ্বেলে পড়িমরি করে এগোতে লাগলো াড়ীর দিকে সেই শেষ বৈশাখের রাত। শেষের ভোরে এতক্ষণ ামার মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে এক নিশ্বাসে কথাগুলো ায় গিলছিলো সুতপা, সুতপা সেন। কাছেই এক পাড়াতে াড়ী, এখন সবে কলেজে উঠেছে। আমার ছাত্রী ছিলো। ামাদের দুজনের উপরই খুব অধিকারবোধ, কোন রকম তায়াক্কা না করেই ফ্রিজ খুলে মিষ্টি খায়। আমায় খুব সুন্দর রে তুমি বলে। ক্লাস এইট থেকে টানা চারবছর আমার াছে পড়েছে। সুতপা বললো, তারপর, তারপর। কি হলো রপর? ওরা কোথায় গেলো, হাসপাতালে না ওঝার কাছে? বললাম, হাসপাতালেই গেলো। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে স্তবে সাপটাকে ধরে নিয়ে গেছিলো। আধমরা সাপটাকে ৌড়িতে ভরে নিয়ে গেছিলো। গোখরো সাপ। সুতপা বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো,আচ্ছা সাপটাকে নিয়ে হসপিটালে গেলো চকেনো? বললাম, সাপের বিষের ধরণ জানতে। ও বললো, বিষাক্ত না নির্বিষ তা জানতে? বললাম, নারে বাবা, কোন রণের বিষ তা জানতে। আসলে জানিস তো সাপের বিষেরও াধারণত মূলতঃ দুটো ধরণ খুব বেশি প্রচলিত নিউরোটক্সিক ও হিমাটোটক্সিক যেগুলো ফণাধারী সাপ যেমন গোখরো, কউটে, শঙ্খচূড়, বা কালাচ এদের বিষ হলো নিউরোটক্সিক বা নার্ভবিষ সেন্টাল নার্ভাস সিস্টেমকে এ্যাটাক করে ভয়ঙ্করভাবে এবং অবধারিতভাবে ব্রেনকে এফেক্ট করে।

আর হিমাটোটক্সিক বিষ কাদের হয় তাহলে? উদগ্রীব সুতপা। বললাম এ বিষ আসলে বোড়া জাতীয় সাপের বিষ। যেমন চন্দ্রবোড়া বা র‍্যাটেল স্নেক বা ভাইপার জাতীয় সাপের বিষ। এই বিষ হার্ট বা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমকে অকেজো করে দেয়। সুতপা জিজ্ঞেস করলো, তুমি যে বললে র‍্যাটেল স্নেক তা র‍্যাটেল স্নেকটা আসলে কি সাপ? র‍্যাটেল মানেই বা কি?

চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, র‍্যাটেল মানে ঝম ঝম করা বা ঝুমঝুম করে বাজনা বাজার মতো আওয়াজ করা। উত্তর আমেরিকায় অর্থাৎ আমেরিকার উত্তরে বা কানাডায় এই সাপ খুব দেখা যায়। আসলে এইসব অঞ্চলে একসময় অর্থাৎ প্রায় দুশো বছর আগে হাজারে হাজারে বাইসন দেখা যেতো। এখনও দেখা যায় তবে, এখন আর অতো দেখা যায় না। এখন অনেক কমে এসেছে।

ও বললো, বাইসন আর বুনো মোষ বা বাফেলো একই? বললাম তুই যেটা ভাবছিস অর্থাৎ আফ্রিকায় যে বুনো মোষ দেখা যায় সেটাকে বলে কেপ বাফেলো, আর আমেরিকার এই অঞ্চলের এদের বলে বাইসন। বললাম, জানিস এদের কতো বড় ঝাঁক হতো? ও হাঁ করে তাকিয়ে বললো, কতো বড়ো? কতো বড়ো? বললাম এক একটা ঝাঁক প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার জুরে থাকতো। এতো পরিমাণে। এমনকি এইসব অঞ্চলে যখন প্রথম রেললাইন পাতা শুরু হয় তখন এবং ট্রেন চলতে শুরু করে তখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো, আসুন, আসুন ট্রেনযাত্রা উপভোগ করুন, আর ট্রেনের জানালায় থেকে রাইফেল দিয়ে বাইসন শিকার করুন। শিকারীরা শিকার করে শুধু বাইসনের জিভটা কেটে নিয়ে আসতো খাবে বলে তো এইসব বাইসন যখন হাজারে হাজারে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে চলে তখন তাদের পায়ের চাপে মারা যেতো এই র‍্যাটেল স্নেকরা। তারপর শত শত বছরের অভিযোজনের ফলে এদের লেজের শেষ প্রায় ছয় ইঞ্চিতে একটা পরিবর্তন আসে। সেখানে চামড়ার আঁশগুলোতে একটার সঙ্গে আর একটার একটু ফাঁক হয়ে যায়। এরা যখন ওই বাইসনের ঝাঁকের দৌড়ে আসা খুরের শব্দ বুকে অনুভব করে তখন ওই লেজের শেষ অংশটা তুলে নাড়িয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে। অস্তিত্ব জাহির করে। ফলে একটা আঁশের সঙ্গে আরেকটা আঁশের ধাক্কা লাগে আর ঝুম ঝুম শব্দ হয়।

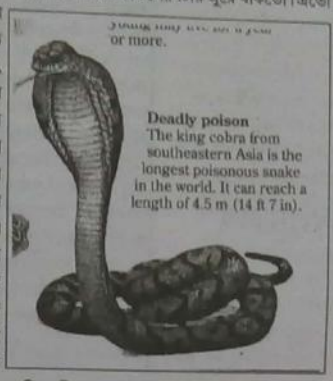

সুতপা চাউমিনের বাটি থেকে একটু কমিয়ে দিয়ে বললো, এই দিক থেকে দেখলে শীতকাল অনেক ভালো, সাপ অন্তত শীত ঘুমে থাকবে। বললাম ওকে, নারে মা, সব সাপের শীতঘুম বা হাইবার নেশন হয় নাা। চন্দ্রবোড়া বা র‍্যাটেল জাতীয় সাপের শীতঘুম হয় না, বরং শীতঘুমে থাকা কোবরা বা ফণাধারী সাপ বা এমনকি দাঁড়াল সাপ বা গ্রাম্যভাষায় যাদের আমরা ঢ্যামনা সাপ বলি তাদের।

তারপর একটু চুপ করে বললো, এই সময়েই তো দশহরা পুজো হয় তাই না? মা মনসার পুজো তো? বললাম, হ্যাঁ, দশহরা বোধ হয় জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় মাসে পুজো হয়। আসলে ওই সময়টায় সাধারণ লোক একটা ঝড় বৃষ্টি চায় বা শিলাবৃষ্টি চায়। কেন শিলাবৃষ্টি চায় কেনো? বিশ্মিত সুতপা। কারণ এই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে সাপ ডিম পাড়ে। শিলাবৃষ্টি বা প্রবল বৃষ্টিতে ওদের ডিম নষ্ট হয়ে গেলে মানুষ স্বস্তি বোধ করে। তবে একটা জিনিস জানবি, সব সাপ কিন্তু মাটিতে ডিম দেয় না। চন্দ্রবোড়া জাতীয় সাপের ডিম কিন্তু মা সাপগুলোর পেটের মধ্যেই ফুটে ওঠে। অর্থাৎ চন্দ্রবোড়া সাপ কিন্তু বাচ্চা প্রসব করে।

সুতপার বিস্ময় খানিকটা কমতে, নিজেই বললো , আচ্ছা সাপ যখন গর্তে থাকে তখন বুঝতে পারে যে কেউ কাছাকাছি আসছে বা আছে? একটু ভেবে ওকে বলি যে, গ্রামে যখন লোকে মাঠে যায় বা চাষের কাজে যায় তখন দেখনি লোকে লাঠি নিয়ে যায়।

ও বললো, লাঠি দিয়ে সাপ মারবে বলে? হেসে বললাম, সে তো ঠিক আছে। আসলে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে গেলে বা তার সঙ্গে পায়ের চলনে একটা ভাইব্রেশন হয়, যেটা সাপ বুক দিয়ে অনুভব করে, এই কম্পন বা ভাইব্রেশনের ফলে সাপ ওখান থেকে পালিয়ে যায়। সাপের কোন বহিঃকর্ণ নেই, অন্তকর্ণ আছে, কতোটা অন্তকরণ আছে তা অবশ্য জানি না। আচ্ছা সাপের বুদ্ধি আছে? এরা পোষ মানে ঠিকঠাক?, মরিয়া সুতপা। বললাম, বুদ্ধি বা ইন্টেলিজেন্স ব্যাপারটা আসলে স্তন্যপায়ীদের যেমন থাকে সরিসৃপদের ততোটা থাকে না। তাদের থাকে ইনসটিঙ্কট বা সহজাত প্রবৃত্তি। আর শুধু সাপ কেনো সাপ তো নয়ই, কোন জন্তু জানোয়ারই ঠিকভাবে পোষ মানে না, যে কোন সময়েই দাঁত বেরিয়ে আসতে পারে। আচ্ছা, সাপের তো বিষদাঁত ভেঙ্গে দিলেই হলো সব খেল খতম। এতে সাপ জব্দ। সুতপা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো।

বললাম, এটা দেখা গেছে যে বিষদাঁত ভেঙ্গে দেবার পরেও কিন্তু বিষদাঁত আবার উঠতে পারে। আর সাপের বৃদ্ধি হয় শেষ দিন পর্যন্ত। ও বললো, আচ্ছা সাপের কোন রোগ হয়? মরে না কেনো তাহলে? বলি যে, হ্যাঁ রে সাপের ও পক্ষ হয়, মারাও যায় তাতে। একটু থেমে সুতপা জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা সাপ যে শিকার ধরে, মানে যখন ইঁদুর ধরে তখন ঠিক দেখতে পায়? রাতে ধরে কি করে? ঠিক দেখতে পায়?

ওর কথার খেই ধরে বলি, সাপ যে সবসময় দেখে ওৎ পেতে শিকার ধরে তা কিন্তু নয়, রাতে বিশেষ করে যখন ওরা শিকার ধরতে বের হয় তখন অনেক সময়ই ওরা উষ্ণ রক্তের প্রাণীর উষ্ণতা কে সেন্স করে। সাপ তো ঠান্ডা রক্তের প্রাণী, সাপের মাথার সামনের দিকে কিছু কোষ সেন্সরের মতো কাজ করে, অর্থাৎ উষ্ণ রক্তের প্রাণীর উষ্ণতাকে অনুভব করে এগিয়ে যায় তারপরে সেটাকে ছোবল বসায়। এরপর বিষে সেটা নেতিয়ে পরে মারা গেল সাপ সেটাকে গিলতে থাকে।

আচ্ছা, তাহলে সাপের যে দুধ খাওয়া বা গরুর পা ল্যাজে জড়িয়ে ধরে গরুর বাঁট থেকে দুধ চোষা বা দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা এসব ক সত্যি? বললো সুতপা।

আমি বলি, দ্যাখ দুধ খেতে পারে শুধু স্তন্যপায়ী জীবরা। বাঁট থেকে বা মায়ের বুক থেকে দুধ খেতে গেলে জিভের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চওড়া ভাব (width or thicken) পুরুত্ব লাগে। নইলে চুষবে কেমন করে। তাই এসব কথা, ভাবনা সর্বৈব মিথ্যে। আর সাপ গিলে খায়। চেটে বা চুঁয়ে খেতে পারে শুধু স্তন্যপায়ীরা। খুব কৌতূহলী সুতপা জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা সব প্রাণীই কি সাপের বিষে মারা যেতে পারে। বললাম, না, সব প্রাণী সাপের বিষে মারা যায় না। যেমন, ঘোড়া, হানি ব্যাজার, এমন কি বেঁজি বা নেউল ও সাপের বিষকে ঘোড়াই কেয়ার করে। ঘোড়ার রক্ত থেকে তো বিষ নিষ্ক্রিয়ক অ্যান্টিভেনম তৈরী হয়। আর হ্যানিবাজার বা নেউল তো সব রকমের বিষাক্ত সাপ শিকার করে মজা করে খায়। সাপেরও কম শত্রু নেই। ময়ূরও সাপ শিকার করে খায়।

তখন ও বললো, আচ্ছা সাপ কি অন্য সাপের বিষে মারা যেতে পারে? বললাম একে, যে শুধু এক সাপ অন্য সাপের বিষে যে মারা যায় তাই নয় অস্ট্রেলিয়ান ব্রাউন ট্রি স্নেক যখন কোন ক্ষত থেকে খুব যন্ত্রণা পায় তখন সেই ক্ষতের চারপাশে সে নিজের শরীরে কামড়ায় আর নিজের বিষ থেকে নিজেই মারা যায়।

সুতপা তখন বললো, আচ্ছা সাপ কি অন্য সাপকেও খায়? ওর প্রশ্নের উত্তরে বলি, হ্যাঁ কিং কোবরা বা শঙ্খচূড় সাপের প্রিয় খাদ্যই তো অন্য নির্বিষ সাপ। এমন কি দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি জায়গায় এই বিশালাকার অর্থাৎ প্রায় আঠারো ফুট লম্বা সাপটির যে পুনঃস্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র আছে সেখানে তাকে যে ইঁদুরটি খেতে দেওয়া হয়, সেটি অন্য নির্বিষ সাপের চর্বি মাখানো থাকে নইলে খাবেই না।

আচ্ছা কিং কোবরাই কি সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ?

ওকে বলি, না। একটা সময় পর্যন্ত বলা হবে। যে মাম্বা বা ব্ল্যাক মাম্বাই সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ, কিন্তু এখন বলা হচ্ছে বুশ মাস্টার যার বিষে নিউরোটক্সিক ও হিমাটোটক্সিক দুটো এলিমেন্টই থাকে। অনেক সময়ই অনেক তথ্য নতুন গবেষণার ফলে বদলে যায়। নতুন ভাবনা আসে। আচ্ছা কি করে বুঝবো যে বিষাক্ত সাপ কামড়াচ্ছে বা বিষহীন কামড়েছে? বলে ওঠে ছাত্রী। ওকে বলি, বিষাক্ত সাপের কামড়ের জায়গাটায় ফ্যাঙস বা দুটো বিষদাঁতের দংশনের চিহ্ন খুব স্পষ্ট থাকে। আর বিষহীন সাপের কামড়ানোর জায়গাটা ঘোড়ার খুরের মতো একটা ক্ষত হয়। বিষাক্ত সাপের দংশনের স্থানটা কিছুক্ষনের মধ্যেই লাল হয়ে ফুলে ওঠে, রক্তপাত হতে শুরু হয়। রোগীর বমি হতে শুরু হয়, চোখে কম দেখে। একটু মন খারাপ করে বললো, তাহলে ঠিক কি করা উচিত বিষাক্ত সাপ দংশন করলে? প্রথমেই বলি ঘাবড়ে যেও না। রোগীকে ওই স্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। ওকে শান্ত থাকতে সাহস দাও। বসিয়ে দাও এমনভাবে যাতে ক্ষতস্থানের থেকে হার্টের দূরত্ব অনেকটা থাকে। ক্ষতস্থান ভালো করে ধুইয়ে দিয়ে একটা টিটেনাস ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে। ওই স্থানে একটা হালকা বিশুদ্ধ ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধন দেওয়া যেতে পারে। আর যতোটা কম নড়াচড়া করে থাকা যায় ততই ভালো। আর যতো দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু করা উচিত। এবার ও আমার কাছে সরে এসে বলল, এবার একটা রিকোয়েস্ট করি? বললাম করো, সুতপা বলল, তপন মোল্লার মেয়েকে তুমি অন্য কিছু দিয়ে কামড়ে দাও। ইঁদুর কিংবা, ছুঁচো, কেমন? বললাম আচ্ছা, তোমার কথাই রাখবো, তাই করবো।

ফোন-৯৪৩২৩৪৭৮০৩

দেশের প্রথম চিকিৎসককে গুগলের শ্রদ্ধা

ভারতবর্ষে প্রথম মহিলা চিকিৎসক আনন্দী গোপাল জোশীর ১৫৩ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁকে গুগুলের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানাল আন্তর্জাতিক সার্চ ইঞ্জিন গুগল। বেঙ্গালুরু চিত্রকর কাশ্মীরা সাবোডের তুলির টানে গুগলের লোগোতে আনন্দী গোপাল জোশীর জীবনের নানান দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ১৮৬৫ সালের ৩১ মার্চ থানে জেলায় জন্ম হয় আনন্দী গোপাল জোশীর। মাত্র ৯ বছর বয়সে গোপালরাও জোশীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৪ বছর বয়সে এক সন্তানের জন্ম দেন তিনি। কিন্তু পর্যাপ্ত চিকিৎসার অভাবে শিশুটির মৃত্যু হয়। তাঁরপরই নিজে ডাক্তারি পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। যুক্তরাষ্ট্রে ওম্যান মেডিক্যাল কলেজ অফ পেনসিলভিনিয়া থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি পান। ১৮৮৬ সালে দেশে ফিরে যোগ দেন কোলহাপুর রাজ্যের অ্যালবার্ট এডওয়ার্ড হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডের ডাক্তার হিসাবে। কিন্তু মাত্র কবছর বাদেই যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন দেশের প্রথম মহিলা চিকিৎসক আনন্দী গোপাল জোশী।

নতুন মারণদূত 'নিপা'

(সতের পাতার পর)

বিপদতো আছেই।, আক্রান্ত ব্যক্তির থেকে সুস্থ দেহে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরণের সংক্রেমণ রুখতে এখনও পর্যন্ত সঠিক কোন চিকিৎসা নেই।

কাদের বিপদ সবচেয়ে বেশি?

১) যারা শুকর নিয়ে নাড়াচাড়া করেন বেশি।

২) যারা বাদুরের সংস্পর্শে আসবেন।

৩) আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে।

এ রোগের লক্ষণ কি?

হঠাৎ জ্বর সঙ্গে মাথা ও পেশীর তীব্র যন্ত্রণা, বমি ও বমি ভাব ঘাড় শক্ত হওয়া এবং ফটোফোবিয়াও হতে পারে। রোগী কোমাতে চলে যেতে পারে।

কি করে ধরা যাবে?

এলাইজা টেস্টের মাধ্যমে জানা যায়।

Scanned by CamScanner

(একের পাতার পর)

নিপা ভাইরাস সংক্রমণ

ম্যালেশিয়া থেকে ১৯৯৮ সালে। পরে সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ে ১৯৯৯ সালে। এরপরে বিভিন্ন দেশ যেমন ক্যাম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা ও ফিলিপাইনে এই ভাইরাসের সংক্রমণের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে ২০০১ সালে এই ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশে যে সমস্ত ফল খাওয়া বাদুড়েরা তালের রস খেতে আসে সেখান থেকে তাদের প্রস্রাব ও লালার রসে মিশে মানুষের দেহেতে চলে আসে কাঁচা তালের রস খাওয়ার ফলে। শুধু তাই নয় কাঁচা যে কোন ফলের মাধ্যমেও এই ভাইরাস সংক্রমিত করে কাঁচা ফল খেকো বাদুড়েরা। এছাড়া এই ভাইরাস ছড়ানোর জন্যে দায়ী হল গৃহপালিত জন্তু যেমন শুয়োর, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, বিড়াল ও কুকুর। ১৯৯৮ সালে ম্যালেশিয়ায় যখন এই ভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে তখন শুয়োরের মধ্যেই এই ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করা গেছিল। সেখান থেকে প্রায় ৩০০ জন ঐ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল এদের মধ্যে মারা গিয়েছিল প্রায় ১০০ জন। ২০০৪ সালে বাংলাদেশে ব্যাপকহারে যখন এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছিল সে সময়ে দায়ী ছিল ফল খেকো বাদুড়েরা। এদেশে শিলিগুড়িতে ঐ ভাইরাস সংক্রমণের জন্যে দায়ী ছিল ঐ বাদুড়েরা। তবে বাংলাদেশে প্রতি বছরই এই ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায় যেমনটা এদেশে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকেনগুনিয়ার মত। বাংলাদেশে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছিল ২০০৪ সাল থেকে ২০১১ সালে বিভিন্ন জায়গায়। নওগা, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, ঠাকুরগাঁ, কুস্টিয়া, পাবনা, নাটোর, দিনাজপুর, কুমিল্লা, লালমোহিরহাট ইত্যাদি জায়গায়। এদেশের বর্ডার জেলাগুলো তাই বাদ যায়নি। নদীয়া, শিলিগুড়ি, ইত্যাদি জায়গাগুলো স্পর্শকাতর এলাকা হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে। নিপা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে যে সমস্ত লক্ষণগুলো দেখা যায় সেগুলো হল ধুম জ্বর, মাথার যন্ত্রণা, আচ্ছন্ন ভাব, ভুল বকা, দিন কে রাত, রাত কে দিন গুলিয়ে ফেলা, ঘোলাটে চাহনী, শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনী, প্রলাপ বকা, শেষপর্যন্ত কোমায় চলে গিয়ে মৃত্যু হয়। এই ভাইরাস দেহের মধ্যে ঢুকে লক্ষণ সৃষ্টি করতে সময় নেয় যাকে ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলে সেই সময়টা হল ৫-১৪ দিন। প্রাথমিক পর্যায়ে লক্ষণগুলো ঠিক ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের মতন, পরে গলায় ব্যথা, বমি, হাতে পায়ে ব্যথার সঙ্গে উত্তোরত্তর জ্বর বাড়তে থাকে ও ইনকেফেলাইটিসের সব লক্ষণগুলো এসে দেখা দিতে থাকে। কখনো কখনো নিউমোনিয়া বা প্রচন্ড শ্বাস কষ্ট দেখা দেয় এবং এর পরেই খিঁচুনী সহ কোমায় চলে যায়। তবে যে সমস্ত রোগীরা এর পরে বেঁচে যায় তাদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাভাবিকতা সব ক্ষেত্রেই ফিরে আসে না, ২০ শতাংশে ক্ষেত্রে স্নায়ুঘটিত দুর্বলতা থেকেই যায়। এই রোগের আক্রান্ত হওয়ার পরে মৃত্যুর হার ৪০-৭৫ শতাংশে, কেননা এ রোগের যথাযথ কোন ওষুধ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। সবটাই লক্ষণ ভিত্তিক ও সাপোর্টিভ চিকিৎসা করা হয়। এ রোগের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন টিকা বা ভ্যাকসিন বের হয় নি। এ রোগের আক্রান্ত হলে এলাইজা, পি সি আর ও ভাইরাস কালচার করে এ রোগ ধরা হয়। সতর্কতাই এ রোগে ঠেকাতে বড় অস্ত্র। ফল খেকো বাদুড়েরা ও খামারের শূকরেরা যেহেতু এ রোগ ছড়াতে সাহায্য করে তাদের ছোঁয়া খাবার কিংবা তাদের স্পর্শ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার ব্যবস্থা করা। কাঁচা ফল খাওয়া চলবে না। পাকা ফল ভাল করে ধুয়ে নিয়ে খেতে হবে। তালের রস খেতে ইচ্ছে করলে সরাসরি খাওয়া চলবে না, গরম করে ফুটিয়ে নিতে হবে। খামারে পশু পাখিদের শুশ্রূষা করার প্রয়োজন হলে হাতে ফুল গ্লাভস ও অন্যান্য প্রতিরোধক জামা কাপড় পরে ওদের গায়ে হাত দিতে হবে ওদেরকে পরিচর্যা করতে হবে। নিপা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের পরীক্ষা করার পরে সব সময়ই হাত ভাল করে ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যারা যুক্ত যেমন ডাক্তার, নার্স, ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ান, গ্রুপ ডি স্টাফ, ফার্মাসিস্ট সকলকে সতর্কতার সঙ্গে এসব রোগীদের পরিচর্চা করতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। আতংকিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু দরকার সদা সতর্ক মনোভাব ও কড়া নজরদারি।

এক নজরে

নতুন মারণদূত 'নিপা'

ডাঃ অর্জুন, এম.বি.এম.ডি

Dr.R.M.L Hospital, New Delhi

'নিপা' ভাইরাস (NIPA Virus)। সংক্ষেপে NIV। সম্প্রতি কেরলে এর প্রাদুর্ভাবে কালিকট শহরে ইতিমধ্যেই মাত্র দুদিনে ৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। পড়শি শহর মলপ্পুরম এবং ওয়েনারেও এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে।

কি করবেন / কি করবেন না

বেশ কিছু দিন টাটকা ফল, ফলের রস এবং অন্যান্য ফলজাত খাবার থেকে বিরত থাকুন।

শূকরের মাংসে যারা খান বা শুকর নিয়ে যাদের কারবার তারা আপাতত শুকরের মাংসে খাবেন না। শূকর নিয়ে নাড়াচাড়া সময় চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন।

নিপা ভাইরাস কি?

সদ্য আবিষ্কৃত এক নতুন ধরণের ভাইরাস যা মালেশিয়ার শুকর চাষীদের দেহে পাওয়া গেছে। ব্রেণ ফিবার এর প্রাথমিক লক্ষণ। খুব বেশি বিপদের? (ছয়ের পাতায় দেখুন)

(তিনের পাতার পর)

ফ্যাট সম্যসার সমাধানে যোগচর্চা

নাম দিয়েছে 'গ্লোবাল এপিডেমিক' বলে। বিশ্বে ওবেসিটির সমস্যায় ভুগছেন প্রায় ১০০ কোটি মানুষ। এর মধ্যে ভারত, চীন, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি জায়গায় 'ওবীস' বা মোটা মানুষের সংখ্যা সব থেকে বেশি। মনে রাখবেন মোটামুটিভাবে নাদুস-নুদুস শিশু মানেই অসুস্থ শিশু। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত এবং কৃত্রিম দুধ খাওয়া শিশুরাই এরকম হয়। অথচ এই রোগে আক্রান্ত শিশুদের দেখেই মা-বাবারা আনন্দিত ও গর্বিত থাকেন।

এই ধরণের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রতিদিন যোগাসন অভ্যাস করলেও সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ম্যাসাজ থেরাপি করালে দ্রুত সুফল পাওয়া যায়। যোগাসন হরমোনকে নিয়ন্ত্রণ করে, হরমোনের ক্ষরণে ব্যালান্স আনে, বাড়তি ক্যালরি খরচ করতে সাহায্য করে, প্রতিষেধক ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, মাংসপেশী নমনীয় রাখে, হার্টকে যথাযথভাবে কাজ করতে সহায়তা করে। নিয়মিত ম্যাসাজথেরাপির মাধ্যমে কোষের খুব তাড়াতাড়ি রক্ত সঞ্চালন বাড়ে যার ফলে জমে থাকা ক্যালরি দ্রুত খরচ হয়। শরীরে ফ্যাট জমে থাকার দরুন কোষে রক্ত সঞ্চালন ঠিকভাবে হয় না তার জন্য হার্টকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। ম্যাসাজ থেরাপি, ব্যায়াম অথবা যোগাভ্যাসের মাধ্যমে এই সঞ্চালন সঠিক হওয়ার দরুন হার্ট অনেক বিশ্রাম পায়। সেইসঙ্গে বাড়তি ফ্যাট ঝরে যায়। এবার যোগাসন বিষয়ে দু চার কথা বলি। 'যোগ' কথাটি এসেছে 'যুজ' ক্রিয়াপদ থেকে যার অর্থ হল যুক্ত হওয়া। অর্থাৎ যোগচর্চার মধ্য দিয়ে আমরা পরমেশ্বরের সাথে যুক্ত হতে পারি। যোগচর্চা প্রচুর সংখ্যক ক্রিয়া অনুষ্ঠান নিয়ে এর বিশাল শাস্ত্র। যোগাসন তার একটি অধ্যায়। যোগাসন হল এমন এক ধরণের অঙ্গ সঞ্চালন যার মাধ্যমে পেশী ও স্নায়ুতো সরল থাকেই এছাড়া দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড থেকে যে হরমোন নিঃসরণ বেশিও হতে দেয় না আবার কমও হতে দেয় না। দেহের বিভিন্ন জায়গায় রক্ত সঞ্চালন সঠিকভাবে করায়। তার জন্য প্রতিদিন অন্তত কয়েকটি যোগাসন আমাদের অনুশীলন করা উচিত নয়। সেগুলো হল- পদহস্তাসন, ভুজঙ্গাসন, অর্ধশলভাসন, পশ্চিমোত্তাসন, সহজ চক্রাসন ¹ ‖ ‖ ‖ (শেষ কিস্তি আগামী সংখ্যায়)

মূল্যবোধ

চারের পাতার পর

জিনিসিগুলির সঙ্গে এতসব অম্লমধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে যে সেগুলিকে উপেক্ষায় ছুঁড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়াও কষ্টকর। অর্থাৎ কি না ঐ বস্তুগুলির ব্যক্তিবিশেষ বা কয়েকজনের কাছে আবেগগত মূল্য (Emotional value) অপরিসীম। যদিও বাজারদরের হিসেবে সেগুলি আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়। পুনর্ব্যবহার অসম্ভব। রি-সাইকেল করাও সম্ভব নয়। সেইকারণেই রিডিউস করে অল্প জায়গায় অনেক জিনিস একটার পর একটা সাজিয়ে রাখা হত। হয়ত পরম যত্নেই কিন্তু বাইরের লোকের কাছে তো আবর্জনার স্তূপ ছাড়া কিছুই নয়।

দিন পাল্টেছে। বাড়ির বদলে এখন ছোটো ছোটো ফ্ল্যাট। যার না আছে মাটি না আছে আকাশ। মাটি ছুঁতে গেলে লিফট দিয়ে বা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হবে। আকাশ দেখতে হলেও একই উপায়ে ছাদে ওঠা চাই। অবশ্য অনেক ভাগ্যবানের ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে এক টুকরো আকাশ দেখা যায়। চার দেওয়ালের মধ্যে জায়গা বড়ই কম। আগে মাপ হত বর্গ মিটারে, তারপর এল বর্গফুট, দুদিন বাদে হয়তো বর্গইঞ্চির মাপে ফ্ল্যাটের মূল্য নির্ধারিত হবে। এর মধ্যে আবার অনেক হিসেবের কারচুপি আছে কোথাও Plinth -এর মাপ, কোথাও Super built ↓ ছাদ, করিডোর, সিঁড়ি, ডাক্ট ইত্যাদি আবাসনের এজমালি সম্পত্তি হওয়ায় তারও মূল্য সমানুপাতিক হারে দিতে হয়, এমনটাই দস্তুর। ফ্ল্যাটটির ব্যবহারের ফলে অবচিতি বা Depreciation অবশ্যই হয়, কিন্তু Real estate এর বাজারমূল্য অনুযায়ী নগরাঞ্চলে ফ্ল্যাটের মূল্য বাড়াকমা করে। এখন Specialization এর যুগ। সবক্ষেত্রেই, পড়াশোনার ক্ষেত্রেও। Highly specialized knowledge উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় হলেও যারা শুধু এই ধরণের জ্ঞানে জ্ঞানবান, কর্মনিযুক্তির জগতে তাদের যথাযথ মূল্য দেওয়ার মত কর্মক্ষেত্র বড়ই কম। এখন অবশ্য Wed based Employment -এর সুযোগ হয়েছে। Online interview ও পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে Video Calling এবং Conference -এর মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন নিজে নিজের মূল্য বোঝা। তারপর দরকার তার মূল্য ও গুরুত্ব বোঝে এমন দু চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে বার করা যারা কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে রেফারির ভূমিকা পালন করতে পারবে। আর তারাই বলে দিতে পারবেন কোথায় গেলে তাদের যোগ্যতার যথাযথ কদর পাবে। সদা পরিবর্তনশীল মানবমনের সুস্থতার সুনির্দিষ্ট মাত্রা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন হলেও আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছেন একটা মাত্রা নির্ণয় করতে যে মাত্রার বাইরে গেলে মনের সুস্থতার হানি ঘটে। যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাহিনে- আমরা কখন কি চাই, কেন চাই, আদৌ চাওয়া বিষটির কোনো প্রয়োজন আছে কিনা। সেসব নিয়ে প্রায় কখনোই ভাবি না, আমরা উন্নতি বা প্রগতি চাই, একই সঙ্গে বর্তমান স্থিতিশীল অবস্থার স্বস্তিটুকু উপভোগ করতে চাই। এ যেন নৌকা তীরে নোঙর বেঁধে পাল তুলে জোরসে বৈঠা বাওয়া। এখানেই আসে মূল্যায়ন ও মূল্যবোধের প্রসঙ্গ। আমার কাছে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত অভ্যুদয় এর সুখ বেশি মূল্যবান না কি বর্তমান পারিপার্শ্বিক এর স্বস্তি বেশি মূল্যবান! এই মূল্যের বোধ আমাদের স্বাভাবিক উৎসাহ জাগ্রত করে। বাইরে থেকে জোর করে কোন কিছুকে মূল্যবান বলে চাপিয়ে দিলে একান্ত বসংবদ ব্যক্তি হয়তো যন্ত্রের মত তা পালন করে। কিন্তু এক্ষেত্রে চেষ্টায় কোনো প্রাণ থাকে না। আর সাফল্যের সুখটিও যেন বারো আনা তারই হয়, যে চাপিয়ে দিয়েছে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অবশ্যই ষোলোআনা দায় বর্তায়, তার শরীর ও মনকে প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করে ব্য হয়েছে তার-ই।

মানুষ নিজেকে ভালোবাসে সবচেয়ে বেশি, ঘণ্টা পর ঘণ্টা নিজেকে সাজায়, পার্লারে যায়, সেলফি তোলে, আপলোড করে। কিন্তু আপলোড কর কার জন্য। এত যে সাজে, দামী দামী পোশাক পর সে কি কেবল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেক দেখার জন্য? মানুষ যেমন নিজেকে ভালোবাস তেমনি ভালোবাসে ভালোবাসতে, যে তার মনে মতন মানুষ। মনের মত মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়া জন্য মানুষের চিরন্তন অন্বেষণ ও প্রচেষ্টা। ঐতি আমাদের শিক্ষা দেয় আত্যন্তিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক থেকে বেরিয়ে একটু একটু করে নিজেকে প্রসারি করতে- অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুব রচনা করতে। ঐতিহ্যের সবটাই ভালো এমন দা করছি না। ঐতিহ্যের নামে শোষণ চলে নীর ঘোর অসাম্য কে বৈধতার তকমা দেওয়া হয়। কি কোনো ঐতিহ্যই দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে না যদি ঐতিহ্য অংশগ্রহণকারী সমাজের মধ্যে একটি বিনিময় ও বন্টন প্রথা গড়ে ওঠে, যাতে ন্যায় বিচা প্রাধান্য থাকে। ঐতিহ্য সংরক্ষণে সম্পদের প্রয়ো আর ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রয়ো বন্টন ও সার্বিক অংশগ্রহন। ঐতিহ্যের প্রতি অতি আনুগত্য অনেক সময় বিচারবিযুক্তিবাদ ও গোঁড় জন্ম দেয়। গোঁড়ারা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে নিজে চারপাশে একটি দৃঢ় প্রাচীর তোলে যাতে বাই মুক্ত চিন্তার হাওয়া তাদের স্পর্শ করতে না পা মিডিয়ার দৌলতে তারা তাকে অতীতের কো মহাকাব্যে কোনো ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে মন বোঝাতে চেষ্টা করে যে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বা মুক্ত চি নয়, ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকাই বেশি মূল্যবান চারপাশে খুঁজলে দেখা যাবে এমন মানুষ অসংখ্য দৈনন্দিন কর্মকান্ডে, পারিবারিক দায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে মানসিক অসুস্থতার কোনো লক্ষণ দেখা না গেলেও যদি এ ধরণের ব্যক্তিতে সামাজিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিতর্কে মতামত দিতে বলা হয় তখনই বেরিয়ে পড়বে তাদের প্রকৃত স্বরূপ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সামাজিকতা, সামাজিক শৃঙ্খলা ও প্রগতি অর্জন ও প্রদান এই পরস্পর বিরোধী বিষয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যে মানসিক স্থিতি ও সুস্থতার দরকার হয়, গোঁড়া বা মতান্ধদের তা থাকে না। মানুষ প্রায়ই ঠিক করতে পারে না, যে সে কী চায়- প্রশান্তি না প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা বা সাফল্য বাইরের স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠার দিকে যত এগোবে প্রশান্তির মাইলফলক ততই পিছিয়ে যাবে। এমনটাই দস্তুর। তবুও তথাকথিত ঐতিহ্য শেখায় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করো, তারপর প্রশান্তি এমনিতেই আসবে। প্রশান্তি একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা যা সামাজিক প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি, নিন্দা স্তুতির উপর নির্ভরশীল নয়। আবার সাত চড়ে রা করে না এমন ঘোর তামসিকের যে প্রশান্তি তাকেও প্রকৃত আদর্শ প্রশান্তি বলা চলে কি? অপ্রতিরোধ ঐতিহ্যগতভাবে পরম আদর্শ। বীর ই কেবল প্রকৃত অর্থে অহিংস হতে পারে। ঐতিহ্যের নামে মনোবল ভেঙে দেওয়া, বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করা কখনোই কাঙ্খিত হতে পারে না। ঐতিহ্যের তাৎপর্য বুঝতে হলে মুক্ত চিন্তা ও বিশ্লেষনী ক্ষমতার দরকার। তা না হলে কতকগুলি কুসংস্কারের শিকার হয়ে মনকে প্রবোধ দেওয়া হবে যে, আমরা ঐতিহ্যের সম্মানকারী সুসভ্য মানুষ। ঐতিহ্য সংরক্ষণ মানে পশ্চাদগামিতা নয়। ঐতিহ্যের প্রকৃতমূল্য উপলব্ধি করে তাকে মাইলফলক করে সামনে এগিয়ে যাওয়াই ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

Scanned by CamScanner

VOLUME XIX ISSUE - 10 JUNE 2018 • SWASTHYA BHABNA MASIK • |RNI NO. 71448/99| • POSTAL REG. NO.:PMC (SB)-117SHY RS. : 2

জরুরী বিজ্ঞাপন

আগামী ২০১৮ - ২০১৯ অর্থবর্ষ বিজ্ঞাপন - প্রাপক তালিকাভুক্তির জন্য সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার তথ্যাবলী আহ্বান

আগামী ২০১৮ - ২০১৯ আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মাধ্যমে সরকারী বিজ্ঞাপন বন্টনের জন্য হুগলী জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা সমূহের একটি অনুমোদিত তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফর্মে তথ্যাবলী পেশ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

হুগলী জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা সমূহের মুদ্রক / প্রকাশকগণ অথবা তদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হুগলী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, চুঁচুড়া থেকে আগামী ০৮/ ০৬/ ২০১১৮ থেকে ১৫/ ০৬/ ২০১৮ তারিখের মধ্যে (সরকারী ছুটির দিন বাদে) উক্ত ফর্ম সংগ্রহ করতে পারবেন। পূরণ করা ফর্ম আগামী ২২/ ০৬/ ২০১৮ তারেখের মধ্যে চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনস্থিত হুগলী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে জমা দিতে হবে। ডাকযোগে পেরিত ফর্ম গ্রাহ্য করা হবে না। নির্ধারিত ফর্ম ১৫/ ০৬/ ২০১৮ তরিখের পর বিতরণ করা হবে না এবং পূরণ করা ফর্ম ২২/০৬/২০১৮ তারিখের পর গৃহীত হবে না।

অন্যান্য তথ্য ও বিষয় জানতে ফর্ম সংগ্ররে সময় আলোচনা করে নেওয়া যাবে।

স্বাক্ষর

স্মারক-৪৬৩/ এইচ.ডি/আই সি এ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারীক, হুগলী

পৌর উন্নয়নে সামিল হয়ে শ্রীরামপুর পৌরসভাকে সাহায্য করুন ও বিভিন্ন পরিষেবা গ্রহণ করুন

ঃ শ্রীরামপুর পৌরসভা কর্তৃক বিভিন্ন পরিষেবা ঃ

❑ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ পরিষেবা- সময় ৭ দিন (অবশ্যই প্রদেয় তথ্য নির্ভুল থাকতে হবে)। ❑ ট্রেড লাইসেন্স পরিষেবা - ৭ দিনের মধ্যে (শর্ত সাপেক্ষে)। ❑ জলের সংযোগ পরিষেবা - (গৃহস্থ ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে)। - সময় ১৫ দিন, ঐ সংক্রান্ত তৎকাল পরিষেবা, সময় ৩ দিন। ❑ গৃহ নির্মাণ নক্শা মঞ্জুর পরিষেবা - সময় ১ মাস। ❑ সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার পরিষেবা - সময় ৭-১০ দিন। (শর্ত সাপেক্ষে)। ❑ জমি-বাড়ির মিউটেশন পরিষেবা - সময় ১ মাস (কার্যকরী ৩ মাসের মধ্যে)। ❑ সম্পত্তির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ পরিষেবা- সময় ৩০ দিন। ❑ ট্রাক্টর পরিষেবা - চাহিদা অনুযায়ী। ❑ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা - চাহিদা অনুযায়ী। ❑ কর আদায় পরিষেবা - সপ্তাহে ৬ দিন। ❑ জঞ্জাল ও ময়লা পরিষ্কার পরিষেবা - সপ্তাহে ৬ দিন। নর্দমা পরিষ্কার পরিষেবা - নিয়মিত। ❑ স্বাস্থ্য পরিষেবা - কম পয়সায় বিশেষ ধরণের বহির্বিভাগে সব রকম স্বাস্থ্য পরীক্ষা, এক্সরে, প্যাথোলজি, ইসিজি পরীক্ষা ও ছানি অপারেশনের (মাইক্রো সার্জারি) ব্যবস্থা সপ্তাহে ৬ দিন। ❑ মরা জীব-জন্তু পরিষ্কার পরিষেবা - চাহিদা অনুযায়ী।

পৌরবাসীদের কর্তব্যঃ-

ক) ঠিক সময়ে পৌরকর জমা দিন। খ) জলের অপচয় বন্ধে পৌর কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করুন। গ) সম্পত্তি কর নিয়মিত জমা দিন। ঘ) আপনার সম্পত্তির যথাযথ মূল্যায়ন নিয়মিত পৌরসভা থেকে করিয়ে নিন। ঙ) আপনার বাড়ির জঞ্জালকে ঠিক জায়গায় ফেলতে পৌর কর্মীদের সাহায্য করুন। চ) প্লাস্টিক প্যাকেট যথা সম্ভব কম ব্যবহার করুন। ব্যবহারের পরে যত্রতত্র বিশেষ করে নালা নর্দমায়, পুকুরে কিংবা গঙ্গায় না ফেলে পৌরসভার ডাস্টবিন কিংবা ভ্যাটে ফেলুন। ছ) গঙ্গায় ফুল মালা, বেলপাতা, পুজোর আবর্জনা ইত্যাদি না ফেলে পৌরসভার নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলুন ও নির্মল গঙ্গা গড়ে তুলতে পৌর কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করুন। জ) মরা জীব জন্তু বাড়ির কাছে না ফেলে পৌর কর্তৃপক্ষকে খবর দিন ভাগাড়ে ফেলার জন্য। ঝ) স্বাস্থ্য কর্মীদের বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহে সহযোগিতা করুন। ঞ) পৌরসভা কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে আগ্রহী হন ও পৌর কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সাহায্য করুন।

-সুন্দর পৌরসভা-আপনার পৌরসভা-শ্রীরামপুর পৌরসভা।

শ্রী অমিয় মুখার্জী, পৌর প্রধান শ্রী উত্তম নাগ, উপপৌর প্রধান

With Best Wishes From:

Orokle Biomedics

April, May, June,

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে

আপনি গ্রাহক হন

গ্রাহক চাঁদা ১ বছরের ২৭ টাকা, ২ বছরের ৫০ টাকা, নগদ / মানি অর্ডার অথবা এম আই সি আর ক্রস চেকে টাকা পাঠাতে পারেন। আপনার পূর্ণ ঠিকানা, পোস্টাল পিন কোড ও ফোন নাম্বার দেবেন। সংস্থার ঠিকানা ঃ- ১৫/সি, রাজা কে এল গোস্বামী স্ট্রিট, শ্রীরামপুর, হুগলী - ৭১২২০১। (০৩৩) ২৬৫২-৪৮৯৯। নিয়মিত পত্রিকা পাবেন বাড়িতে বসেই।

এই পত্রিকায় ইচ্ছুক বিজ্ঞাপন দাতাদের অবগতির জন্য জানাই **Black and White Rs. 30/ - per Col. cm/Colour 60.- per col. cm.**

অভিজ্ঞান যোগা এ্যান্ড ফিজিওথেরাপি সেন্টার

(স্থাপিত ঃ ২০০০)

৫৭, বাসবাগান লেন (ডাঃ অসিত দত্ত-র ক্লিনিক), মানিকতলা, শ্রীরামপুর, ও মহেশ্বরী ভবনের পাছে, রিষড়া, হুগলী।

বৃহস্পতি ও শনিবার বিকেল ৫.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ ফোন ঃ ৯০৫১৩৫৭২২৩/ ৮৩০৭১৫৯৯৭ হোয়াটস্ অ্যাপ নং- ৮৭৭৭৮৫৭০০৪ Website: www.sudiptabiswasyoga.com, Facebook: Abhijnan Yoga Physio Centre

শরীরের নানা জায়গায় ব্যথা, স্ট্রোকের পরবর্তী সমস্যা, পেটের বিভিন্ন সমস্যা, মনে টেনশন, দুর্বলতা, ঘুম হচ্ছে না, পড়াশোনায় মন নেই, অল্প বয়সেই যৌন কাজের অনেক বেশি ইচ্ছা, এনার্জি কম, স্মৃতিশক্তি কম, থাইরয়েডের অসুখ, সুগারের প্রবলেম, মোটা হয়ে যাওয়া, মাথার ..., সাইনাস-এর প্রবলেম - এরকম যে কোন সমস্যায় চলে আসুন। সপ্তাহে ১ দিন বা মাসে ... দিন। খরচ খুবই কম। যোগচর্চা অথবা ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে অসংখ্য অসুখ সারান। স্ত্রী ও পুরুষের আলাদা ব্যবস্থা আছে। এছাড়া যাঁরা অসুস্থ নন তারাও ভবিষ্যতে উপরিউক্ত অসুখগুলো ঠেকিয়ে রাখার জন্য আসুন।

যোগাযোগ ঃ- শঙ্করশ্রী সুদীপ্ত বিশ্বাস

(যোগাপ্যাথিষ্ট, ন্যাচারোপ্যাথিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট ও সমাজসেবী), প্রতিষ্ঠতা ও সম্পাদক, ...PC,RYCS(NGO) B.A.(C.U.), D.A.T.H.R.Y.(KOL), T.T.in B.B.Y.T. & M.T.(KOL) Trained in EDP by sisi (Govt.of ...), S.S.B.D.M. (KOL)., Science Journalism & Writing method by SAB (Kol) & Govt of India.

দেবায়ন স্পোকেন ইংলিশ সেন্টার

আপনার অথবা আপনার পরিবারের কোন শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সদস্যর যদি ইংরাজীতে জ্ঞান কম থাকে, তবে চলে আসুন। বয়স ৮ থেকে ৮০। শুধু cc শেখা থাকলেই চলবে। যিনি শেখান, তিনি খুই ঠান্ডা মেজাজে, বিশদ গ্রামার শিখিয়ে ছ'মাস অথবা এক বছরেই শিক্ষার্থীকে ইংরাজীতে দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলেন। নির্ভুল ইংরাজী বলতে ও লিখতে পারবেন।

এঁনার পরিচয় ঃ— **রেবা মুখার্জী বিশ্বাস, M.A.**

* প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা : F.M. School, Bora, Hooghly * প্রাক্তন শিক্ষিকা, রিষড়া বিদ্যাপীঠ, P.I. * বর্তমানে কোষাধ্যক্ষ ও PRO, রাজদীপ যোগা এ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, শ্রীরামপুর * প্রকাশকঃ 'রাজদীপ' পত্রিকা * ইংরাজী পড়ানোর ২৪ বছরের অভিজ্ঞতা। সহকারী যোগাথেরাপিষ্ট ও যোগা ট্রেনার, AYPC (from 2001) & RYCS (from 2006) Mob : 9051357223, 9830715997

একটি শিশুর জন্মের পর থেকে তার দৈহিক, মানসিক, মেধাবৃত্তি অর্থাৎ সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে কি কি করণীয় বা অকরণীয় সে সম্পর্কে আমরা যেমন অনেক কিছু জানি আবার অনেক কিছু জানি না। সেই সব 'অজানা' কে জানতে অবশ্যই পড়তে হবে - ডাঃ কুন্তল বিশ্বাস - এর

সন্তান হোক আরও বুদ্ধিমান

প্রাপ্তিস্থানঃ — ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ ও স্বাস্থ্য ভাবনা মাসিক এর দপ্তর

ফোন - ৯৪৩৩৩৪৮৫৮৮

সমস্যা পাঠান SMS মারফৎ

আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ কি শারীরিক বা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন ? তাহলে SMS মারফৎ আমাদের জানান। আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর দেবেন বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ/বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা। টাইপ করুন SWASTHYA BHABNA (স্পেস) আপনার সমস্যা (স্পেস) আপনার নাম, বয়স ও ঠিকানা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হলেও জানাবেন) আর পাঠিয়ে দিন এই নম্বরে।

9433345590/91

সম্পাদক মন্ডলী ঃ- সম্পাদক ঃ অজিত মন্ডল.
কার্যকরী সম্পাদক ঃ ডাঃ পি. কে. দাস, ঃ বার্তা সম্পাদক ঃ সীতাংশু কুমার ভাদুড়ী।
সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ সুহাস ভট্টাচার্য, ডাঃ কুন্তল বিশ্বাস, ডাঃ অসিত দত্ত।
পৃষ্ঠপোষকতায়ঃ- ডাঃ এস দাস, প্রেসিডেন্ট, হ্যানিম্যান মিশন, কোলকাতা।

...স্বাধিকারী স্বাস্থ্য ভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষে শ্রী অজিত মন্ডল কর্তৃক ১৫/সি, রাজা কে এল গোস্বামী স্ট্রিট, শ্রীরামপুর, হুগলী- ৭১২২০১ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক নিউ এস এন্ড এস প্রিন্ট সার্ভিস, ২৯সি, অ্যান্টনি বাগান, কোলকাতা- ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক অজিত মন্ডল। Published by Ajit Mondal on behalf of (or owned by) Swasthya Bhabna Welfare Society and printed at New S & S Print Service, 29C, Antony Bagan, Kolkata - 700 009 and published at 15/C, Raja K. L. Goswami Street, P.O. Serampore, Dist. Hooghly Pin -712 201. Editor Ajit Mondal

Scanned by CamScanner